139

আকবর।

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রণীত।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি—কলিকাতা

১৩০৫

Calcutta:

PRINTED BY R. DUTT,

HARE PRESS:

46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

20, CORNWALLIS STREET.

মঙ্গলাচরণ।

পত্র সংযোগে ক্ষুদ্র কীটও

পঞ্চাননের

অঙ্গ সঙ্গ লাভ করে, পবিত্র হয়;

ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র

"আকবর"ও

হউক।

আকবর।

প্রথম খণ্ড।

১

বাল্যকালে যে স্থানটুকু পৃথিবী বলিয়া জানিতাম তাহার কেন্দ্র স্থান দেবগ্রাম। সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি এই গ্রামে মাধব বাবুর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়িতাম। আকবর মণ্ডল ও ললিতকিশোর দত্ত আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ললিত তালুকদারের পুত্র, গৌরাঙ্গ, পুষ্টায়তকলেবর, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মাধব বাবুর স্বগণ। আকবর সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলে, গৌরকান্তি না হইলেও সৌম্য-মূর্ত্তি ও বলিষ্ঠ। তাঁহার মাতুল কলিকাতার ডাক্তার, বড়-লোক। সেই উপলক্ষে আকবরের পিতাও সমাজে একটু গৌরবান্বিত ছিলেন। আকবরের বিশ্বাস—লেখা পড়া শিখিয়া তিনিও মাতুলের ন্যায় বড় লোক হইবেন।

১২৬০ সালে শীতকালে আমরা প্রথমশ্রেণীতে উঠিলাম। এই শ্রেণীতে কখনই তিন চারি জনের অধিক ছাত্র হইত না। সেই জন্য এই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে একখানি মাত্র বেঞ্চ। ললিতকিশোর মুসলমানের সহিত একাসনে বসিয়া অধ্যয়ন করিতে আপত্তি করিলেন। অধ্যক্ষের অভিপ্রায় মতে আপত্তি মীমাংসার ভার পণ্ডিতমহাশয়ের উপর পড়িল। তাঁহার মুখে শুনিলাম—স্কুলের মেম্বরদিগকে লইয়া মীমাংসা করিবেন। যত দিন ঐ বিচার-সভা না বসে, তত দিনের জন্য আমার স্থান কায়স্থ ও মুসলমান সহাধ্যায়ীর মধ্যস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইল। ললিত বেঞ্চের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। সভা কিন্তু আর বসিল না। ইন্‌স্পেক্টরের দোহাই দিয়া পণ্ডিত মহাশয় নাকি ঐ কথাটা উড়াইয়া দিলেন।

শনিবার। তিনটার সময় স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। আকবর আমাকে বলিলেন,—'অমর, বহুরাশিকের অঙ্কগুলি পণ্ডিত মহাশয় কষিয়া দিলেন; আমি কিন্তু ভাল আয়ত্ত করিতে পারি নাই। এস না, দুজনে অঙ্কগুলি কষি; রৌদ্র পড়িলে বাটী যাইব। একা যাইতে যদি না পার, আমি বরং তোমাকে বাটীতে রাখিয়া যাইব।'

আমি বলিলাম,—'দুগ্ধ-পোষ্য বালক নাকি যে একা যাইতে পারিব না। তুমি আরও দূরে যাবে; যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়—ভয় পাও; বল,—আমি বরং তোমাকে তোমাদের বাটীতে রাখিয়া আসিব।'

আকবর। আমি কাহাকে ভয় করি—যে তোমার মত কড়িঙের সাহায্য চাহিব?

আমি। বড় ফড়িঙ নই আকবর। এ কেও কেটা নয়। নূতন পৈতা হয়েছে—ব্রহ্মতেজ শরীরে আর ধরিছে না। তোমাদের গ্রামে যেতে গাঙ্গিনা-পারে ভূত আছে। আজি বরং ব্রহ্মতেজে তাহাকে পোড়াইয়া আসিব; চিরকালের মত তোমার ভয় ঘুচাইয়া দিব।

আকবর। আমি কিন্তু এক চপেটাঘাতে তোমার ব্রহ্মতেজ একবারে নিবাইয়া দিতে পারি।

আমি। খুব সাবধান, এখনই ভস্ম করিয়া দিব। তুমি ত ভাই ক্ষুদ্রপ্রাণী; মনে করিলে এখনই স্কুল শুদ্ধ ভস্মসাৎ করিতে পারি।

আকবর। মুসলমানের কাছে ও বুজরুকি খাটে না। জান ত—সুলতান মামুদ, তৈমুর লঙ। আমাদের পিঁয়াজের গন্ধে ব্রহ্মতেজ দেশ ছাড়িয়া পালায়। মুসলমানের বেগধারণ করে কে?

আমি। তোমরা ত ভাই, সে মুসলমান নও। তোমরা হ'লে আসল পাতি; জাতি হারায়ে মুসলমান হয়েছ। তোমাদের শরীরে হিন্দুর রক্ত বহিতেছে; ব্রহ্মতেজ তোমাকে ত বেশ পরিপাক করিয়া লইবে। বল, হাতে হাতে দেখাইয়া দি; নিমেষ মধ্যে তোমাকে ভস্মসাৎ কি ধূমসাৎ করে, বিনা ফুঁকে উড়াইয়া দি।

আমি ফুৎকারের অনুকরণে মুখভঙ্গী করিলাম। মুখবাদ্য হইল। আকবর বলিলেন,—'ব্রাহ্মণ বড় মিষ্টভক্ত। একটি সুমিষ্ট চাঁটি খাও দেখি।'

আকবরের কোমল হস্ত আমার মস্তকে হাসি-মিশান একটি অতি সংক্ষিপ্ত আঘাত করিয়া, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া বেগে চলিয়া গেল।

আমি। তোমার মত পিপীলিকারে আর ব্রহ্মতেজ কি দেখাব।

দেখ বরং—এই বজ্রমুষ্টি কেমন তোমার অস্থি মাংস—রক্ত পর্য্যন্ত চূর্ণ, ধূলিসাৎ, বায়ুসাৎ করে—

ললিতকিশোর বাহিরে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাগ্‌যুদ্ধ-মিশান দৃশ্যযুদ্ধ দেখিলেন। আকবরের হস্ত আমার মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র আরক্ত নয়নে বলিলেন,—'তুই যে ব্রাহ্মণের মাথায় মারিলি?'

আমার বজ্রমুষ্টি—আকবরের মাথায় পড়িল না। ললিতের দিকে চাহিয়া হাসিলাম। আকবর থামিয়া গেলেন।

ললিত বলিলেন,—'এস অমর, মুসলমান কখন ভাল হয়? আর উহার সঙ্গে কথা কহিও না। আমাদের বসিবার জন্য যদি স্বতন্ত্র বেঞ্চ না হয়, তাহা হইলে কল্যই আমরা নাম কাটাইয়া শিবগঞ্জের স্কুলে যাইব।'

আমি বলিলাম,—'তুমি বড় রাগিয়াছ, বাড়ী যাও। আমি অঙ্ক কয়টা করিয়া যাইব।'

ললিত। তুমি ত বড় গাধা; পৈতা হয়েছে, তবু মুসলমানের সঙ্গে ভাব। জাতি যাবার ভয় নাই?

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—'না। তুমি এখন বাড়ী যাও।'

আমার হাসিতে ললিতের রাগ বাড়িয়া গেল। আমার হাত ধরিয়া বলে টানিলেন; আমি পড়িয়া গেলাম,—মস্তক বেঞ্চে আহত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ আসিয়া জুটিল। বলিলাম,—'যাও,—তোমার সঙ্গে আমি যাইব না। মুসলমান তোমার অপেক্ষা ভাল।'

ললিতের ক্রোধ সীমা ছাপাইয়া গেল। দুই চারিটা বজ্রমুষ্টি আমার পৃষ্ঠে ও মস্তকে পড়িল।

আকবর বলিলেন,—'কেন তুমি ছেলে মানুষকে মারিবে ?'

ললিত। তোর কি ?—আমার ইচ্ছা। আবার মুষ্টি-বৃষ্টির উদ্যোগ। আকবর ললিতের দুই হাত ধরিয়া বলে পশ্চাতে বিক্ষেপ করিলেন। দুই জনে বেশ বাধিয়া গেল। মল্লযুদ্ধ ;—শেষে ধূলায় পড়িয়া দুই জনে অশিক্ষিত ব্যায়াম-বিদ্যার পরিচয় দিলেন। যে সকল বালক তখনও চলিয়া যায় নাই—তাহারা আসিয়া চারিদিকে দাঁড়াইল ; শেষে রক্ত দর্শন। অন্য বালকেরা এবার বীরদ্বয়কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিলেন। মৈত্রী-বাধায় বোধ হয় ক্রোধ ও রণস্পৃহা বাড়ে ; উভয়েই সকলের হাত ছাড়াইয়া আবার আক্রমণের উদ্যোগে বদ্ধপরিকর হইলেন।

আমার প্রহারবেদনা জীর্ণপ্রায় হইয়া আসিল ; আবার যুদ্ধ বাধে দেখিয়া ত্বরিতপদে উভয়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম। ললিত ছুটিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার বক্ষঃস্থল আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, —'তুমি ক্ষান্ত হও, না হয়, আমাকে মারিয়া ফেল।'

অন্যান্য বালকেরা আমার সহায় হইল। সকলের সমবেত চেষ্টায় মল্লদ্বয় স্কুলগৃহের বাহিরে বিভিন্নদিকে নীত হইলেন। যুদ্ধের শান্তি হইল। সে দিন আর অক্ষ কষা হইল না।

২

পরদিন পড়া শুনা বড় হইল না। ললিতকিশোর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিলেন না। পণ্ডিত মহাশয়েরও একটু ঔদাসীন্য, একটু বিমর্ষভাব। অপরাহ্নে মাধব বাবু ও মেম্বরগণ আসিয়া ছাত্রগণের এজাহার লইলেন। সর্ব্বাগ্রে ললিতকিশোর ; তিনি ঘটনা যথাযথ বর্ণন করিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই আপনার

দোষ দেখেন নাই—সুতরাং স্বীকার করিবেন কেন? তাঁহার মতে আকবর হিংস্র শ্বাপদ; আমি বিধর্ম্মী এবং এই বিবাদ ও রক্তপাতের মূল কারণ। তাহার পর আকবর ও অন্যান্য বালকদিগের এজাহার হইল; কেবল আমি বাকি থাকিয়া গেলাম।

পরদিন বিদ্যালয়ে আসিয়া শুনিলাম—অধ্যক্ষেরা আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা দোষী স্থির করিয়াছেন। আমি পিতৃহীন, সহায়হীন;—বিনা বেতনে স্কুলে পাঠ করি। সুতরাং আমারই ত দোষ বেশী। সে জন্য বড় ক্ষুব্ধ হইলাম না; তবে সভ্যগণ যে আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না—সেই জন্য একটু দুঃখ হইল। আবার দুঃখের উপর দুঃখ—খাঁড়ার ঘা! ললিত বলিলেন,—'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।' ললিতের মুখের তিরস্কার যে বড়ই মর্ম্মভেদী।

ললিতের বয়স প্রায় ষোল বৎসর; আমাদের তিন জনের মধ্যে, অন্ততঃ আমার মতে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্, সকলের অপেক্ষা ভাল ছাত্র। আমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম,—ভক্তি করিতাম। তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার কথা শুনিতে বড়ই আনন্দ হইত। দুই এক দিনের জন্যও স্কুল বন্ধ হইলে কোন না কোন কাজের উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের বাটীতে যাইতাম;—তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। ললিত বড় সুকণ্ঠ। জল খাবার ছুটির সময় কখন কখন টেবিল বাজাইয়া গান করিতেন; আমি সকলের অস্তিত্ব ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই গান শুনিতাম; আর ভাবিতাম,—জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এমন গান কেহ গাইতে পারে না।

আকবরের বয়স প্রায় ১৩ বৎসর। পড়া শুনায় তাঁহার বিশেষ যত্ন থাকিলেও আমি তাঁহাকে ললিতের সমকক্ষ

মনে করিতাম না। মুসলমান হইলেও তাঁহার স্বভাবে উগ্রতা ছিল না; তবে পল্লীবাসী হইলেও একটু সৌখিনতা দেখা যাইত। সৌন্দর্য্যময়, ধন-জন-সহায় ললিতকিশোরের ন্যায় তিনি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের নিকট গৌরব ও সম্মান পাইতেন না। তন্নিবন্ধন আকবরের মনে বোধ হয় একটু ঈর্ষার ছায়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর আবার ললিতের ঈষদবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বাভাবিক বদনভঙ্গী। যে কারণেই হউক, আমার এই দুই সহাধ্যায়ীর মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মে নাই।

এই সময়ে আমার বয়স প্রায় দশ বৎসর। অল্পবয়স্ক ও ক্ষুদ্রকায় বলিয়া বিদ্যালয়স্থ বালকবৃন্দের সসম্মান দৃষ্টি আমার উপর কখন পতিত হয় নাই।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'অমর, এ বৎসর তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে বলিয়া এই কয় মাসের জন্য আমি তোমার এখানে পাঠ করিবার অনুমতি লইয়াছি। এখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করা আর না করা তোমার হাত।'

আমার দুই চক্ষু বোধ হয় আরক্ত হইল। কোন উত্তর না দিলেও পণ্ডিত মহাশয় আমার মুখ দেখিয়া আর কোন কথা কহিলেন না।

ইহার কয়দিন পরে শুনিলাম—বিদ্যালয়ে পাঠের অধিকার থাকিলেও মেম্বরগণের বিচারে আমার বিনা বেতনে পড়িবার অধিকার গিয়াছে। এখন অবধি আমাকে বেতন দিয়া পড়িতে হইবে। ঘোর দুর্ভাবনা আসিয়া দেখা দিল। রাত্রিতে জননীর নিকট সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বলিলাম। বলিলাম,—'মা, আমার বুঝি পড়াই বন্ধ হইয়া যায়।'

মা অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন,—'বাবা, সবই অদৃষ্টে করে; নতুবা স্কুলের কর্তারা তোমার দোষ দেখিবেন কেন?

মহাভারত এই সকল কথা শুনিলে তোমার কত নিন্দা করিবেন। আর একথা না বলিলেও ত টাকা দিবেন না।'

আমি বলিলাম,—'তবে বেতনের কথা তাঁহাকে বলিও না; আমি বরং সহরে গিয়া কোন বড় লোকের আশ্রয় লই। সেখানে পড়া শুনারও সুবিধা হইবে।'

আমার কথায় মা যেন একটু কাতর হইলেন—দেখিয়া আমি নীরব হইলাম।

বোধ হয় অর্দ্ধরাত্রে সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিল। মা আমার মাথার নিকট বসিয়া কপালে, মস্তকে হাত বুলাইতেছেন; কপালপতিত কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতেছেন। মা ক্ষীণ-কাতর-স্বরে বলিলেন,—'ঠাকুর, যেমন দিন দিয়াছ, তাহাই ভাল; যাহা দিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট; আমার যে অমূল্য ধন আছে, তাহা ত আর কাহারও নাই। দয়াময়,—দেখিও,—দুঃখিনীর সর্ব্বস্বধন হরণ করিও না।'

আমি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিলাম,—'মা, ওরূপ কথা কেন বলিতেছ; কি হয়েছে মা?—আমার কথা বলিতেছ?'

মা উত্তর করিলেন না। একটু পরে আবার বলিলাম,—'মা, তুমি না বলিলে কি আমি সহরে যাইব? আমার নাহয় পড়া নাই হল; যেমন আছি, তেমনই থাকিব। তুমি কথা কও না কেন মা? আমি কোথাও যাব না।'

মা বলিলেন,—'বাবা, আমারও অনেকবার মনে হয়েছিল, বেণেদের এই লাঞ্ছনা না সহিয়া বরং সহরে যাই; সেখানে কাহারও বাড়ীতে থাকিয়া তোমাকে প্রতিপালন করি। কিন্তু লোকে তোমাকে দাসীপুত্র বা রাঁধুনির ছেলে বলিবে—তাহা কিরূপে সহিব। আমার একখানি সোণার কবচ আছে; তোমাকে দিয়ে যখন তিনি চলে

যান, সেই সময়ে ঐ কবচখানি আপনার হাত থেকে খুলে আমার হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন ; মনে সাধ ছিল—তুমি বড় হলে কবচখানি তোমার হাতে পরাইয়া এক বার দেখিব। গচ্ছিত ধন অতি যত্নে লুকায়ে রেখেছি। দুদিন উপবাসী থাকিলেও কখন মনে হয় নাই—সেখানি বিক্রয় করিয়া খাই। এখন জানিলাম—আমার সাধ মিটান পরমেশ্বরের ইচ্ছা নয়। কবচখানি বেচিলে তোমার বেতন চলে যাবে। আর সহর থেকে একটি ছাতি আনিও।

আমি মাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম ; তিনি বুঝিলেন না। শেষে বলিয়া ফেলিলাম,—'মা, কবচখানি বেচিলে বাবা যদি রাগ করেন। তিনি ত আমাদিগকে দেখিতেছেন।'

মা কথা না কহিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন বিদ্যালয়ে গিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট চিরবিদায় চাহিলাম। তিনি একটু বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—'তুমি ভাল করিয়া পড়,—বেতনের জন্য ভাবিতে হইবে না।' আমি মনের আগ্রহে বলিয়া ফেলিলাম,—'আমাকে পড়িতে দিন্;—আমি নিশ্চয় এবৎসর পরীক্ষায় প্রথম হইব।'

পণ্ডি। তোমার মত দুরবস্থ অনেকে পরীক্ষায় শীর্ষ- স্থান পাইয়াছে। যাহাদের পড়িবার, শিখিবার সুবিধা আছে, তাহারা শিখে না।

ললিতকিশোর বলিয়া উঠিলেন,—'মুখে বলিলেই ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হইল না। কেবল সাধ থাকিলেই ত বড় হয় না।'

পণ্ডিতমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'ভাল, পরীক্ষার ফল দেখিয়া বুঝিব, তোমাদের মধ্যে কাহার কথা সার্থক। কেমন আকবর! তুমি প্রথম হইতে পারিবে না?'

আকবর একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন,—'আপনি যখন বলিলেন, তখন পারিব।'

ললিতকিশোর অধর কুঞ্চিত করিয়া একটু হাসিলেন। সেই হাসিতে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও দর্প মিশান—মোটামুটি দেখিলেও দেখা যায়।

আকবর দেখিলেন ; তাঁহার স্বভাবপ্রসন্ন মুখে একটু কঠোর-ভাব দেখিলাম। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না।

বাটীতে আসিয়া জননীকে সমস্ত বলিলাম। তাঁহার প্রসন্ন গম্ভীর বিশাল চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। কোন কথা বলিলেন না। আমি মনের আবেগে তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইলাম। বলিলাম,—'মা, কি ভাবিতেছ ?—সর্ব্বদা এত ভাবিলে কয় দিন বাঁচিবে ?'

মার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। আমাকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন ; আর চক্ষুজল আমার পীঠ বহিয়া ধারা বাঁধিয়া পড়িল। জন্মাবধি কখন মার চক্ষে জল দেখি নাই। গতরাত্রিতে তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়াছি ; আর আজি তাঁহার চক্ষে প্রথম অশ্রু দর্শন করিলাম। মার স্থির প্রসন্ন মুখে কখন কাতরোক্তি শুনি নাই, কখন বিষাদের ছায়া দেখি নাই। আজি তাঁহার চক্ষুজলে আমার মনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, মোহ ঘুচিল। এই বয়সেই একটু প্রবীণতার অঙ্কুর বসিল। পূর্ব্বে কত প্রকার আবদার করিতাম, মাকে কত উৎপীড়িত করিতাম। কিন্তু এই দিন অবধি আমার বাল্যলীলা ঘুচিয়া গেল। ইহার পর মা আমাকে আব্‌দার, অত্যাচার ও উৎপীড়নে কত প্রবর্ত্তনা দিতেন। আমার স্বভাবপরিবর্ত্তনে তাঁহার বিষণ্ণতা বাড়িয়াছিল কিনা জানি না। আমার কি সাধ্য—বাড়বানলে দহ্যমান সেই গভীর সাগরের আন্তরিক উষ্মা অনুভব করি। মা যেমন ছিলেন,—সেইরূপই রহিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সাশ্রু প্রেমা-

গিকনে আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনুষ্য হইলাম। আর বুঝিলাম—মার মনঃ-ক্লেশ যদি ঘুচাইতে না পারি, তাহা হইলে এ জীবন বিড়ম্বনা মাত্র।

৩

মহাভারত দত্ত পিতার ব্যবসায়ে সরিক গোমস্তা ছিলেন। তাঁহার নিজের মূলধন ছিল না। পিতার কাজ দেখিতেন; তন্নিমিত্ত উপস্বত্বের তৃতীয়াংশ তাঁহার প্রাপ্য ছিল। পিতা প্রজাদিগকে দাদন দিতেন; অর্থাৎ অগ্রিম মূল্য দিয়া ধান্যাদি শস্য ক্রয় করিতেন। মহাভারত খাতকদিগের নিকট তাগাদা করিয়া শস্যগুলি আদায় করিতেন। তাহার পর বর্ষায় শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে এবং গ্রাম পর্য্যন্ত নৌকার পথ খুলিলে সমস্ত শস্যাদি নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া বিক্রীত হইত। ১২৫৩ সালে দেশে বসন্তরোগের মহামারী উপস্থিত হয়। আমাদের বাটীর সকলেই রোগে আক্রান্ত হন; এবং মা ও আমি ব্যতীত সকলেই সেই মহামারীতে কালকবলিত হন। পিতার মৃত্যুর পর মার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বোধ হয় এই নিরাশ্রয় শিশুর মুখ চাহিয়া দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। তিন মাস কাল কতক অজ্ঞান, কতক সজ্ঞান অবস্থায় শয্যাগত থাকিয়া মা আরোগ্যলাভ করেন। ইহার পরেও চারি পাঁচ মাস কাল আমি পীড়িত ছিলাম। মা সর্ব্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া বসিয়া থাকিতেন। অন্য কোন দিকে চাহিয়াও দেখিতেন না।

এই কালের মধ্যেই আমাদের অবস্থাগত বিপর্য্যয় ঘটিল। গৃহে ধন-সম্পত্তি যাহা ছিল—সমস্তই জননীর পীড়াকালে অপহৃত হইয়াছিল। এখন ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতি উল্লেখে এবং সত্য বা মিথ্যা ঋণের দায়ে মা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিলেন। মহাভারত স্বয়ং

উত্তমর্ণ সাজিয়া আদালতের সাহায্য লইলেন। যাঁহারা আমাদের পক্ষ ছিলেন, অর্থলোভ তাঁহাদেরও ধর্ম্মবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিল। আমাদের তালুক ও নিষ্কর ভূমিগুলি একে একে মহাভারতের সর্ব্বগ্রাসী কবলে পড়িল। তথাপি পীড়ন-চক্রের বিরাম নাই। শেষে আমাদের বহির্ব্বাটী, সদর ও খিড়্‌কির পুষ্করিণী, বাগান দুটি এবং তৎসংলগ্ন খালি জমিগুলিতে টান পড়িল। এই সময়ে নাকি পাষাণমানব বিচারকের হৃদয়েও একটু ব্যথা লাগে। মহাভারত চঞ্চল হইয়া দেশের লোকের মধ্যস্থতায় আত্মসমর্পণ করিলেন। সপক্ষপাতী, অপক্ষপাতী, বহুপক্ষপাতী মধ্যস্থগণের বিচার অনুসারে মহাভারত বার্ষিক ১০০ টাকা খাজানা দিতে স্বীকার করিয়া ঐ লোভনীয় সম্পত্তিগুলি অধিকার করিলেন। এখন ঐ বার্ষিক একশত টাকা আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আমি নাবালক। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সম্পত্তি আমার। সুতরাং আমিই মহাভারতের নিকট প্রাপ্য খাজানার অধিকারী। মা স্ত্রীলোক; হিসাব রাখিতে ভাল পারেন না; বুঝিয়া খরচ করিতে পারেন না,—মহাভারতের মুখে এখন সদাই এই সকল কথা। সদাই তাঁহার ভয়,—পাছে নাবালকের অর্থ অপব্যয়ের জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে দায়ী হইতে হয়। সেই জন্যই নাকি খাজানার টাকা দিতে তিনি বড়ই কুণ্ঠিত। কেবল সঙ্কোচ দেখাইয়াই মহাভারত সন্তুষ্ট নহেন; সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বর্গীয় জনক ও সুরদেবী জননীর নানা দোষের উল্লেখ করিয়া তিরস্কার করেন। তিনি নাবালকের বড়ই হিতৈষী। আবার নাবালক যেমন বড় হইয়া উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হিতৈষিতাও বাড়িতেছে!

প্রাপ্য খাজানার জন্য জননীকে মহাভারতের নিকট টাকার প্রয়োজন প্রমাণ করিতে এবং ব্যয়ের তালিকা দিতে হইত। মহাভারত তালিকার কতক মঞ্জুর, কতক নামঞ্জুর করিয়া, মঞ্জুরি টাকার কিস্তিবন্দি স্থির করিয়া দিতেন। এই কারণে আমাদের ঘরগুলি একে একে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। ভূমিকম্পের কল্যাণে আমাদের দেশে ইষ্টকালয়ের চলন কম। এখন আমাদের একখানি মাত্র তৃণাচ্ছাদিত বড় ঘর। তাহার কিয়দংশ বেড়া দ্বারা পৃথক্ করিয়া আমি সদরের ঘর করিয়াছি। বাটীতে আর এক খানি ঘর আছে; তাহার অর্দ্ধাংশ পাকশালা; অপরার্দ্ধে আমাদের দুটি গাভী থাকে। এবার টাকা অভাবে আমাদের ঘরগুলিতে খড়ও উঠিল না।

আমাদের অবস্থা-বিপর্য্যয়-ঘটিত কথার আভাস মাত্র জানিতাম। ঐ সকল বিষয়ে যাহাতে আমার মন আকৃষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে মার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এখন দুই তিন দিন একটু অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত জানিলাম। কিন্তু মাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। আমি এক কথায় প্রবীণতা পাইলাম এবং তাহার প্রথম ফল—অমর-মগ্ন-জীবন স্নেহময়ী জননীর নিকটেও মনের ভাব গোপন করিলাম। ইহার মূল হয়ত আমাদের দারিদ্র্য।

সে যাহাই হউক, পণ্ডিতমহাশয়ের কথা এবং মার অশ্রু-জল আমার শরীরে অমানুষিক বল আনিয়া দিল। মনেও উৎসাহ ধরে না। দিন রাত্রি ভুলিয়া, আহার নিদ্রা ভুলিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলাম। স্কুলে যাইতে আসিতে অনেক সময় লাগিত; সে সময়েও পাঠ আবৃত্তি করিতে করিতে চলিতাম। আহারের

সময় পার্শ্বে পুস্তক রাখিতাম—পুস্তক দেখিতাম ; চক্ষু ও মনের সাহায্য না লইয়াই হস্ত অন্ন লইয়া মুখে তুলিয়া দিত।

ললিতকিশোরের উপর আমার রাগ বা অভিমান দুচারি দিনে চলিয়া গেল। আবার পূর্ব্বভাব আসিল। তিনি ক্লাসে প্রথম থাকিতেন। নির্ব্বিবাদে ও আনন্দের সহিত তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতাম। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব-খ্যাপনে আমার বড়ই তৃপ্তি হইত। আমাদের আত্মীয়বর্গ সময়ে সময়ে আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন,—এক সঙ্গেই ত পড় ; তুমি ললিতের মত হইতে পার না কেন ?

আমি অবিকৃত মুখে উত্তর করিতাম,—ললিতের মত কিরূপে হইব ; তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার ক্ষমতা আমার অপেক্ষা কত বেশি।

আমার এই রূপ উত্তর শুনিয়া একদিন মহাভারত রাগ করিলেন ; মার সম্মুখে আমাকে অলস ও অকাল-পক্ব বলিলেন। মা তাঁহার সেই প্রসন্ন গম্ভীর মুখে উত্তর করিলেন,—ললিত বড় লোকের ছেলে, তাহার পড়াশুনার কত সুবিধা। অমরকে ত কেহ পড়া বলিয়া দিবার লোক নাই ; তাহাতে আবার ছেলে মানুষ।

মহাভারত কুপিত হইলেন ;—আদর দিয়া ছেলের পরকাল নষ্ট করার অপরাধে মাকে কত তিরস্কার করিলেন ; শেষে আমাদের ভাত বন্ধ করিবার প্রস্তাব ;—তিনি অনর্থক বৎসর বৎসর এক রাশি টাকা জলে ফেলিতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিলেন। মা উত্তর করিলেন না।

প্রায় দুই মাস পরে শুনিলাম—পণ্ডিত মহাশয় নিজেই আমার স্কুলের বেতন দিতে স্বীকার করিয়াছেন। বাড়ীতে আসিয়া মাকে বলিলাম। তিনি কহিলেন,—'তাঁহার ভাল হইবে।

দুঃখিনীর সন্তানের দিকে তিনি চাহিয়াছেন,—পরমেশ্বর তাঁহার দিকে চাহিবেন।'

চারি দিন পরে স্কুল বসিবার কিছু পূর্ব্বে আমি এক হাঁড়ি ক্ষীরের সামগ্রী মাথায় লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন,—'ও কি, অমর?'

আমি। ক্ষীরের সামগ্রী।

পণ্ডি। কেন? কোথায় পাইলে?

আমি। আপনি আমার স্কুলের বেতন দিবেন শুনিয়া মাকে বলিয়া ছিলাম। আমাদের গরু আছে, দুধ দেয়। তিন দিনের দুধ ক্ষীর করিয়া মা আপনার জন্য পাঠাইয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়, মা আপনাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। বলিয়াছেন—পরমেশ্বর আপনার দিকে চাহিবেন।

পণ্ডিতমহাশয় নীরব। অনেক ক্ষণের পর বলিলেন,—'আমি তোমার স্কুলের বেতন দিব—কোথায় শুনিলে?'

আমি। ললিতকিশোরের মুখে শুনিয়াছি।

কিয়ৎক্ষণের পর পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন,—'তোমার জননীকে আমার প্রণাম জানাইও। ভাল করে পড়। তুমি যদি এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হও, তাহা হইলে আমি বড় মনঃক্লেশ পাইব।'

আমি কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম। দুই হাত মর্দ্দন করিতে করিতে বলিলাম,—'যদি মরিয়া যাই, সেও ভাল, তথাপি আপনার মনে কষ্ট দিব না।'

পণ্ডিতমহাশয় বিদেশীয় লোক হইলেও আমাদের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কথা কিয়ৎপরিমাণে জানিতেন। তবে আমাদের

কিরূপে চলে, পরিবারে কে কে আছেন—এ সমস্ত তাঁহার জানা ছিল না। তিনি আমাকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমিও অকপটে সমস্ত বলিলাম। মহাভারতের সকল কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দরিদ্রতার কঠোর শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তখনও আমার বুদ্ধির চতুরস্রতা ও বাক্‌পটুতা জন্মে নাই। পণ্ডিতমহাশয় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া প্রায় সকল কথাই বাহির করিয়া লইলেন। শেষে বলিলেন,—মহাভারত দত্ত যে এত দুষ্ট লোক, তাহা তিনি জানিতেন না। তাহাকে তিনি স্বয়ং বলিবেন এবং অন্য লোকের দ্বারাও বলাইবেন।

এতক্ষণে আপনার বুদ্ধির দোষ দেখিতে পাইলাম। একটু ভয় হইল, মুখ শুকাইল। শেষে বলিলাম,—'আপনি কোন কথা বলিলে তিনি রাগ করিবেন, আর মাকে বড় তিরস্কার করিবেন।'

পণ্ডিতমহাশয় আমার মাথায় হাত দিয়া কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিলেন। তাঁহার অসম্ভব আদরে কৃতার্থ হইলাম। মনের দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহার প্রশ্নমত আরও কত কথা বলিলাম;—মহাভারত আমাদিগকে বৎসরে ত্রিশটা টাকাও দেন না; এই কয় মাসের পর সে দিন চারিটি টাকা দিয়াছেন; একটি টাকায় চাউল কেনা হইয়াছে; দুটি টাকা দোকানের ঋণ শোধে গিয়াছে; একটি টাকা আছে; মা সেটিতে আমাকে ছাতি কিনিতে বলেন; মার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে—পরা যায় না; আমি ছাতি না কিনিয়া তাঁহাকে কাপড় কিনিতে বলিয়াছি;—বৃষ্টি ত আর রোজ হয় না,—দুই এক দিন ভিজিয়া গেলেই বা কি; আমি বৃষ্টির ভয় করি না;—রৌদ্রেই বা আমার কি করিবে;—মার কেবল ভয়—আমার অসুখ করিবে; কেবল বলেন,—

রৌদ্রে মুখ লাল হয়ে গিয়াছে;—এই রূপ কত কথা আদরে গলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিলাম; পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত শুনিলেন। শেষে স্কুলে যাইবার সময় পথে বলিলেন,—'অমর, আমার কথাটি যেন মনে থাকে; পরীক্ষায় প্রথম হইতে পারিবে ত?'

আমি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিশ্চয় হইব। তবে ললিতকিশোরের উপর ত হইতে পারিব না।

পণ্ডি। কেন পারিবে না? ললিতের অপেক্ষা তোমার বুদ্ধি কম নয়; ললিত তেমন পরিশ্রম করে না। তুমি পরিশ্রম করিলেই পারিবে। কেমন পারিবে ত?

আমি সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম,—'যদি সম্ভব হয়, ত পারিব।'

পণ্ডি। সবই সম্ভব; যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে লোকে সব করিতে পারে। কোন কাজেই—পারিব না—বলিতে নাই। পারিব কি না—এরূপ সন্দিহান হইয়া কাজ করিলেও ফল পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই কার্য্য সাধন করিব—এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকিলেই লোকে জয় লাভ করে।

আমি সোৎসাহে বলিলাম,—'নিশ্চয়ই এবার পরীক্ষায় প্রথম হইব।'

পণ্ডিতমহাশয় আবার আমার মস্তকে হস্ত অবমর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন,—'আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার কামনা সিদ্ধ হউক।'

ইহার দুদিন পরে আকবর এক জোড়া থানের ধুতি ও একটা ছাতি আমাদের বাটীতে দিয়া গেলেন। আমি তখন বাটীতে ছিলাম না। দ্রব্যগুলি কে দিয়াছেন—মা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পর দিন আমিও অনেক অনুনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কোন

সদুত্তর পাইলাম না। বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে বলিলেন,—আবার জিজ্ঞাসা করিলেই পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া দিবেন।

আমি নিরুপায় হইয়া নিরস্ত হইলাম।

৪

আকবরও প্রাণপণে লাগিয়া গিয়াছেন। আমরা সময়ে সময়ে স্কুলের ছুটির পর দুজনে বসিয়া পড়িতাম, অঙ্ক কষিতাম। কোন দিন সন্ধ্যা হইয়া যাইত। আকবর বাটী পর্য্যন্ত আসিয়া আমাকে রাখিয়া যাইতেন। এক এক দিন পণ্ডিতমহাশয়ের আদেশে তাঁহার বাসাতেও যাইতাম। তিনি অতি যত্নে আমাদিগকে পড়াইতেন; সর্ব্বদা তাঁহার বাসায় গিয়া পড়িতে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট আদেশ না পাইলে আমরা প্রায়ই সে দিকে ঘেঁষিতাম না। কারণ, আমরা বাসায় গেলেই জলখাবার হিসাবে তাঁহার কিছু ব্যয় হইত। আকবর এ কথাটা প্রথমে ধরেন নাই। দরিদ্র বলিয়াই হিসাবটা আমার মনে উদয় হইল এবং আকবরকে বলিলে তিনিও বুঝিলেন।

ছুটির সময় আমরা পড়িতাম;—ললিত দেখিয়াও দেখিতেন না—কিছু বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই আমি বড় সঙ্কুচিত হইতাম; আকবরের সঙ্গে বসিয়া পড়িতেছি বলিয়া অপরাধীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইতাম। ললিত প্রায়ই কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেন; আকবর একটু হাসিতেন; কিন্তু আমি মর্ম্মাহত হইতাম।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে চারি পাঁচ জন ছোট বড় তালুকদারের পুত্র ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই ললিতের সমবয়স্ক; আর পদমর্য্যাদাতেও আমাদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ। ললিত এখন

সহাধ্যায়ীদিগকে ছাড়িয়া ঐ সকল সঙ্গীর সহিত মিশিলেন। তাহাদের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করিতেন; আমি কোন কোন দিন তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতাম;—আমাকে দেখিয়াও দেখিতেন না; আর আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্তই বোধ হয় সঙ্গিগণের সহিত চীৎকার করিয়া হাসিতেন—আমোদ করিতেন। সে হাসি, সে আমোদ সরল নয়—বুঝিতাম। অন্ততঃ সেইরূপ আমার মনে হইত। তাঁহারা সকলেই সুপরিচ্ছন্ন;—সুন্দর বসন, জামা, চাদর; সুন্দর পাদুকায় শোভিত-চরণ; কাহারও বা মস্তক সুন্দর সীমন্ত-শোভিত। এদিকে আমার পরিচ্ছদ—কেবলমাত্র ধুতি ও উত্তরচ্ছদ; তাহাও জীর্ণ, জলধৌত,—রজকের লৌহমসৃণ নহে।—ভাল জুতা নাই, জামা নাই।—সকল দিন মাথায় তৈলও পড়িত না। সুতরাং সাময়িক অবজ্ঞা-দৃষ্টি ভিন্ন অন্যরূপ অভ্যর্থনা ললিতের নব-সঙ্গিগণের নিকট পাইবার প্রত্যাশা ছিল না। সঙ্গিগণের দৃষ্টি আমার দিকে না থাকিলেও ললিতের ছিল। ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার পার্শ্ব বা পশ্চাৎ ছাড়িলে অমনি তাঁহার দৃষ্টি আমার অনুগামী হইত। আবার চারি চক্ষুর মিলন হইলেই অন্যমনস্কের ন্যায় অন্যদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন।

ললিতের ন্যায় সৌন্দর্য্য কোথাও দেখিতাম না। আকবরও সৌম্যমূর্ত্তি; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দীপালোকের নিকট খদ্যোতিকার ন্যায়—চক্ষেই ধরিত না। তাহার উপর আমি জানিতাম—ললিত আমাকে ভাল বাসেন। আমি যে তাঁহার চিহ্নিত ও আজ্ঞাবহের মধ্যে—তাহাও তিনি জানিতেন। ললিত আদেশ করিলে আমি বোধ হয় আকবরের সাহচর্য্য ছাড়িতাম,—আমার সাহচর্য্যে যে ললিতেরই পূর্ণ অধিকার;—দয়া করিয়া গ্রহণ

করিলেই কৃতার্থ হইতাম। তবে তিনি আমার সহিত কথা কহিতেন না, আপাতউপেক্ষা দেখাইতেন,—তাহাও যে অভিমান-জনিত,এই বয়সেই তাহা বুঝিয়াছিলাম; আরও বুঝিয়াছিলাম—প্রণয়েই অভিমানের উদ্ভব,—প্রেমের পরিমাণ অনুসারেই অভিমানের আতিশয্য বা লঘুতা হইয়া থাকে; বুঝিতাম বলিয়াই অবজ্ঞা ও অপমান সহিয়াও, আকবরের বিদ্রূপ সহিয়াও সময় পাইলেই ছায়ার ন্যায় ললিতের অনুগামী হইতাম। ললিত কথা কহিতেন না বলিয়া একত্র একাসনে বসিয়াও কথা কহিতাম না। ভাবিতাম না—ললিতে আমাতে কত প্রভেদ;—ললিত সকল বিষয়েই আমার অপেক্ষা কত বড়। কিন্তু প্রণয় ছোট-বড়-জ্ঞান উঠাইয়া দেয়;—অমন সাম্যপ্রসূ অব্যর্থ উপায় ত জগতে আর নাই। ললিতকে ভাল বাসিতাম —এই অধিকারে তাঁহাকে আপনার ভাবিতাম। আর যে আপনার, তাহাকে কি আর ছোট বড় মনে করা যায়। পৃথগ্‌বুদ্ধি না থাকিলে ছোট-বড়-জ্ঞান আসে না; সুতরাং ললিতের প্রাধান্য জানিয়াও তাঁহাকে সে চক্ষে দেখিতাম না। তিনি বড় হইলেও আমার। এই বুদ্ধির সাহায্যেই বোধ হয় লোকে ঈশ্বরকে ভাল বাসে, তাঁহাকে বন্ধু বলে,—আপনার বলে;—আবার রামপ্রসাদের ন্যায় জোর করিয়া দুকথা শুনাইয়া দেয়।

যেমন আঘাত করিলেই আঘাত লইতে হয়, সেইরূপ ভাল বাসিলেই প্রায় ভালবাসা পাওয়া যায়। যেখানে সহজে ভালবাসা পাওয়া যায় না, সেখানেও জল দিয়া কাপের জল আকর্ষণের ব্যবস্থা আছে। ললিত প্রধান, ললিত বড়; তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে ভাল বাসিয়াছিলেন কিনা জানি না। সে অনেক দিনের পুরাণ কথা। তবে ইহাও সম্ভব যে আমাকে নিতান্ত অনুগত, ললিত-

গত-প্রাণ দেখিয়া সেই প্রধানের করুণা-সঞ্চার হইয়াছিল ;—সেই করুণাই ক্রমে পাকিয়া প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপেই না ঈশ্বরপ্রেম পাওয়া যায় ?

আকবর আমাকে ভাল বাসিতেন ; সুতরাং আমিও আকবরকে ভাল বাসিতাম। ভালবাসার সম্মুখে জাতিভেদ, বর্ণভেদ থাকে না। প্রভাত-রৌদ্র অঙ্গে মাখিয়া সকল পদার্থই মোহন উজ্জ্বলরূপে দেখা দেয়। ভালবাসা-মাখান পদার্থ আরও উজ্জ্বল, আরও মধুর। আমি ব্রাহ্মণ, আকবর মুসলমান ; কে ছোট, কে বড়—তাহা আমি জানি না। আর আমার জননীর মতে ইহাতে ছোট বড় হয় না। তবে সামাজিক সংস্থান অনুসারে আমাদের পরস্পর দূরতা অত্যন্ত অধিক। কিন্তু প্রণয় রেলওয়ে-টেলিগ্রাফের অপেক্ষাও দূরত্ব-সংকোচক ; আমাদের উভয়ের অন্তরে আদৌ অন্তর ছিল না। একত্র আহার বিহার না করিলে ভালবাসা জন্মে না,—পরস্পরের উপকার না করিলে প্রণয় কিছুই নয়,—এ সকল কথা আমি স্বীকার করি না। প্রণয়পাত্র কিছু না করিলেও প্রিয়,—তাহাকে দেখিয়া, তাহার কথা ভাবিয়া, তাহার স্বত্তামাত্র অনুভব করিয়া যে অতুল আনন্দ,—তাহাই যথেষ্ট ; সে আনন্দের সীমা নাই,—সূর্য্যালোকে অন্ধকারের ন্যায় হৃদয়ের পাপ তাপ, শোক-দুঃখ সেই আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া যায়। প্রেম আমাদিগকে পবিত্র করে, আমাদিগকে নীচতা, স্বার্থপরতা ছাড়িতে শিখায় ; স্থূল কথা—আমাদিগকে মানুষ করে। প্রেম স্বর্গীয়। জগদীশ্বর না প্রেমময় ?

ললিতের অবজ্ঞা-অবহেলা-মিশান ব্যবহারে সময়ে সময়ে মনের ভিতর বড়ই ভার অনুভব করিতাম। তাহাতে হৃদয় যেন এক

এক সময় পেবিত, ক্লান্ত হইয়া উঠিত। সে সময় কিছুই ভাল লাগিত না। উদাস মনে বসিয়া থাকিতাম;—বেড়াইতাম,—কথা কহিতাম,—কাজ করিতাম,—পড়িতাম;—অথচ কিছুই করিতাম না;—নিজের সত্তাই ভুলিয়া যাইতাম; সেই সময়ে আকবরের সহাস্য-বদন সান্নিপাতিক বিকারে অমোঘবীর্য্য বিষবড়ির কাজ করিত। বুঝিতাম না,—জানিতাম না,—অথচ মনের কুজ্ঝটি সরিয়া যাইত,—প্রসন্নতা আসিত। আবার স্বাভাবিক উৎসাহের সহিত পড়াশুনায় মন দিতাম। সেই জন্যই বলিলাম,—প্রেম-ভাজন কিছু না করিলেও যাহা করে—অন্যে তাহা পারে না।

একে মুসলমান, তাহার উপর গৃহস্থের ছেলে—বলিয়াই বোধ হয় ললিত আকবরকে ঘৃণা করিতেন। অন্য কারণ ত দেখি না। তবে প্রেমের ন্যায় ঘৃণাও কখন কখন অকারণে জন্মে। আবার আকবর আমাকে ভাল বাসেন—ইহাও হয় ত ললিতের ঘৃণার পোষক হইয়াছিল।

আমার মার মত মা জগতে আর কেহ কখন পাইয়াছেন কিনা জানি না। তাঁহার সবই ভাল। আবার তিনি যাহা ভাল বাসিতেন—তাহা যেন কতই মধুর,—তাহা আমারও প্রিয়। আর আমি যাহা যাহা ভাল বাসিতাম—সে সমস্তই তাঁহার আদরের সামগ্রী। ললিতকে না দেখিয়াও তিনি তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। এখন আবার আকবর আসিয়া তাঁহার অসীম ভালবাসায় ভাগ বসাইলেন। মা সময়ে সময়ে আমার জন্য ভৃষ্ট তণ্ডুল চূর্ণের গুড়মিশ্রিত মোদক ও ক্ষীরের লাড়ু প্রস্তুত করিতেন। প্রস্তুত হইলেই পরদিন আকবরকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিতেন। আকবর বড় মিষ্টান্নপ্রিয় ছিলেন; তাঁহার লজ্জাও বড় ছিল না। সংবাদ পাইলেই আসিয়া

তাঁহার প্রাপ্য অংশ আদায় করিতেন। তাঁহার জননী অনেক দিন স্বর্গগতা হইয়াছেন। নিজের মা নাই বলিয়া মনের আশা মিটাইবার জন্তই হউক,—আমার সহিত প্রণয় বশতই হউক, আর মাতৃদেবীর অনিবার্য্য আকর্ষিণী শক্তিতেই হউক, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন। একদিন নিজাংশ মোদক-লাড্ডুতে আকবরের প্রয়াস মিটিল না। বলিলেন,—'মা, আজি তোমার লাড়ু বড় ভাল হয়েছে; ভাল হয়েছে—বলিলেই আবার দিতে হয়, না মা?' মা হাঁড়ি ছুটি বাহিরে আনিয়া আকবরকে মোয়া লাড়ু দিতে গেলেন; আকবর গ্রীবা উন্নত ও বক্র করিয়া সঞ্চয় দেখিলেন। যাহা পাইলেন তাহাতে মন উঠিল না। বলিলেন,—'মোয়া লাড়ু আরও ভাল হয়েছে।' আবার কিছু লাভ হইল,—সেগুলি বদনে উঠিয়া অন্তর্হিত হইল;—বলিলেন,—'আমি কি বলিতেছি, শুনিতে পাও না? তোমার মোয়া লাড়ু বড়ই ভাল হয়েছে।' এইরূপে আমার চারি পাঁচ দিনের জল খাবার শেষ করিয়া আবার মিষ্টান্নের গুণ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। মা বলিলেন,—'আর যে নাই, আকবর।' আকবর সেইরূপ উন্নত-বক্র-গ্রীব হইয়া হাঁড়ির ভিতর দেখিতে গেলেন। মা হাঁড়ি ছুটি অধোমুখ করিয়া ধরিলে আকবর বলিলেন, 'অনেক করিয়া প্রস্তুত করিতে পার না?—কালি আসিব; অনেক মোয়া লাড়ু করিয়া রাখিও।'

আকবর চলিয়া গেলেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে আমি বাড়ীতে আসিলাম। জানিতাম,—জলখাবার আছে,—চাহিলাম। মা বলিলেন,—'ছুটি জল-দেওয়া ভাত খাও।'

আমি। আজ ত খাবার আছে;—আজ আমি মা জল-দেওয়া ভাত খাব না।

মা। ঘরে যাহা ছিল—আকবর খাইয়া গিয়াছে। ছুটি ভাত খাও।

আমি। সব খেয়ে গেলেন। মা, আকবর বড় দুষ্ট—না মা ?

মা। না বাবা, আকবর বড় ভাল ছেলে। আমরা দীন দুঃখী হয়ে পড়েছি। নহিলে অমৃতে অরুচি কাহার। সন্তানের মত আব্দার করে। কাল আস্বে বলে গিয়েছে—মোয়া করিতে বলেছে। চাউলও ত ফুরায়েছে।

মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সামান্য ক্ষীণ বায়ু-প্রবাহ মাত্র—কিন্তু আমার অন্তরে শেলসম পশিল। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা উড়িয়া গেল।

পরদিন আকবরকে আসিতে নিষেধ করিলাম। আকবর শুনিলেন না; আমার সঙ্গে আসিলেন। বাটীর নিকটে আসিয়াও যখন ফিরিলেন না, তখন সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম; ঘরে চাউলের পর্য্যন্ত অভাব,—মা বড়ই মনে কষ্ট পাবেন—বলিলাম। তথাপি আকবরের চৈতন্য হইল না।—আকবর যে বড় মানুষের ছেলে।

আকবরকে বসিতে বলিয়া মা তণ্ডুলপাত্র লইয়া বাটীর বাহিরে গেলেন। আমি বুঝিলাম,—তিনি প্রতিবেশি-গৃহে ধার পাইবার প্রত্যাশায় চলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার এই ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছি; কিন্তু আজি যেন নূতন চক্ষুতে দেখিলাম। মনের কষ্ট সাম্লাইতে না পারিয়া আকবরকে বলিলাম। তখনও আকবরের চক্ষু ফুটিল না; বলিলেন,—'চাউল আসিলে ভাজা হবে—তার পর মোয়া হবে। আমার ক্ষুধার জ্বালা নাই!'

আমি। গুড় নাই, মোয়া কিরূপে হবে?

আক। তবে আজ যাই; কাল বরং আসিব।

পরদিন কিন্তু আকবরের চৈতন্য হইল। তাঁহার আহারও কমিল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমার ক্ষুদ্র শরীরে অমানুষিক বল আসিয়াছে। কিছুতেই শ্রান্তি নাই—কিছুতেই ক্লেশ বোধ নাই। সমস্ত রাত্রি বসিয়া অধ্যয়ন করি। মাও আমার সহিত সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন; সময়ে সময়ে আমাকে বাতাস করেন, দীপে তৈলাদি দেন, মশা তাড়াইয়া দেন—আর আমার পড়া শুনেন। আমি সহস্র বলিলেও ভিতরে গিয়া শয়ন করেন না। শেষে আর নিষেধ করিতাম না; শুনিবার লোক পাইয়া নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে বসিয়া পাঠ করিতাম।

ষাণ্মাসিক পরীক্ষা হইয়া গেল। ললিত বরাবর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতেন। এবার ব্যতিক্রম ঘটিল। আকবর পরীক্ষায় প্রথম, ললিত দ্বিতীয়, আমি তৃতীয় স্থান পাইলাম। পরীক্ষার ফলে মনঃপীড়া পাইলাম না। ললিত আমার অপেক্ষা অনেক ভাল ছাত্র। আবার তাঁহার নীচে থাকিতেই আমার তৃপ্তি অধিক। আকবরকেও ভাল বাসিতাম;—সুতরাং তাঁহার নীচে যাইতেও আমার কষ্ট হইল না। ললিতের বাটীতেই ভূচিত্র ছিল। আকবরের না থাকিলেও তিনি এক মুসলমান প্রতিবেশীর বাটীতে গিয়া ভূচিত্র অনুশীলন করিতেন। আমার কোন সুবিধাই ছিল না; সুতরাং ভূগোলে বড় কম নম্বর পাইলাম। পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়াও সুবিধা করিতে পারিলাম না।

পরীক্ষার ফল দেখাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'দেখ ললিত, তুমি বরাবর প্রথম থাকিতে; এবার পারিলে না। আর তিন নম্বর কম পাইলে সর্ব্বনিম্নে তোমার স্থান হইত। বিশেষ যত্ন না করিলে বৃত্তি পরীক্ষার তুমি শীর্ষস্থান পাইবে না।

ললিতের চক্ষু ফুটিল ; আবার আকবরের নিয়ে পড়াতে অত্যন্ত মনঃপীড়াও পাইলেন। এত দিনে আমাদের প্রকৃত পরীক্ষা উপস্থিত। সকলেই বৃত্তি ও সম্মানের প্রত্যাশায় বদ্ধপরিকর হইলাম। বৃত্তি গৌরবের সামগ্রী ;—না পাইলে ললিতের মনে কষ্ট হইবে। কিন্তু ধরিতে গেলে বৃত্তির টাকায় তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আকবরের সম্বন্ধেও সেই কথা। এ দিকে বৃত্তির টাকা কয়টি আমাদের জীবনধারণের একটা উপায় হইবে। সুতরাং বৃত্তিতে আমারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

আমার যুক্তি স্বার্থ-প্রণোদিত সন্দেহ নাই। কিন্তু একবারে স্বার্থ ছাড়িলেও ত সংসার চলে না ;—জীবন রক্ষাই হয় না। জীবজগতের অবস্থা ও গঠন এবং জীবসমষ্টির সহিত আমাদের সম্বন্ধই ইহার প্রমাণ। তবে স্বার্থের অনুরোধে পরের অনিষ্ট করাই দোষ। ইহাই বোধ হয় নীতিসম্মত। সার ফিলিপ সিড্‌নি নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়া আপনার পানীয় জলটুকু দিয়া অন্যের পিপাসা দূর করেন। লোকে তজ্জন্য তাঁহাকে চিরপ্রশংসা করিয়া আসিতেছে। সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোককে পরহিত-ব্রতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এরূপ কার্য্যেরও উপযোগিতা আছে। কিন্তু সকলেই সিড্‌নির অনুকরণ করিলে সংসার চলিবে না। অন্ততঃ তাহা হইলে ভাল লোকগুলি মরিয়া যাইবে। আমার মনে হয়—ঐরূপ কার্য্য মানুষের সৎপ্রবৃত্তির সাময়িক-উত্তেজনা-প্রসূত। সময়বিশেষে এই উত্তেজনা এত প্রবল হয় যে, লোকে সঙ্গত সীমা অতিক্রম করিয়া কাজ করে ;—আর সঙ্গে সঙ্গে ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। আবার অসৎপ্রবৃত্তির অসীম উত্তেজনায় ঐরূপে কাজ করিলে লোকের নামে একটা অনপনেয় কলঙ্কের দাগ থাকিয়া যায়। বাস্তবিক লোকে

বরাবর ঐরূপ কার্য্য করে না। ঘটনাচক্র-মূলক ঐ সকল কার্য্য আধিদৈবিক বলিলেও চলে।

এই বয়সে যতদূর চিন্তা চলে—তাহার সাহায্যে আমার সংকল্পে বড় দোষ দেখিলাম না। মা, পণ্ডিত মহাশয় ও আকবর সকলেই ভিন্ন ভিন্ন কথায় ঐ একই মত প্রকাশ করিলেন। কেবল ললিতকে বলিতে সাহসে কুলাইল না। বিশেষতঃ ললিত এখন আর আমার সহিত মন খুলিয়া কথাই বলেন না।

৫

আজি তিন চারি দিন একরূপ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। সময়ে সময়ে বর্ষণের বেগ একটু কমে; আবার মুসল-ধারে বর্ষিতে থাকে। এই অসাময়িক বৃষ্টিতে দরিদ্রের ক্লেশের সীমা নাই। দীন দুঃখী লোকে খাটিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে না;—বাদ্‌লার দিনে খাটায় কে? গৃহে ধান্য থাকিলেও লোকে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রাভাবে শুকাইতে পারে না। অসময়ের বর্ষা,—লোকে দুর্দ্দিনের জন্য প্রস্তুত হয় নাই,—তণ্ডুলাদি প্রস্তুত ও ইন্ধন-সংগ্রহ করিয়া রাখে নাই। কাজেই দরিদ্রের কষ্ট। আমরাও দরিদ্র। এই কয়দিনই বায়ু বৃষ্টির সাহচর্য্য করিতে ছিল। আজি রাত্রিশেষে একটু বেশি বিক্রম দেখাইয়া বহিল। আমাদের গৃহসংস্কার হয় নাই;—ঝড়ের বেগে চালের কতকগুলি খড় স্থানচ্যুত হইল, কতকগুলি উড়িয়া গেল;—বৃষ্টি সবলে গৃহমধ্যে প্রবেশিল।

আমি একখানি পুরাতন খাটের উপর বসিয়া পড়িতেছিলাম। মা আমার পার্শ্বে আসীনা। আসারবাহী সমীরণ আসিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিল। গৃহে অগ্নি ছিল;—মা অনেক যত্নে প্রদীপটি

জ্বালিয়া একটি ভগ্ন লণ্ঠনের মধ্যে খাটের উপর রাখিলেন। লণ্ঠনের দুই দিকে কাচ ছিল। এক দিক দেয়ালে ঢাকা পড়িল; অন্য দিক দুই খানি পুস্তক দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দীপ রক্ষার উপায় করিলাম। ঘরের ভিতর জল পড়িতে ছিল। যেখানে এতক্ষণ জল পড়ে নাই, খাটখানি সেই খানে ছিল;—এখন চালের খড় উড়িয়া গিয়া সেখানেও জল পড়িল। শয্যাটি গুড়াইয়া আমরা মাতাপুত্রে তদুপরি বসিলাম। নূতন ছাতাটি মাথায় দিয়া বৃষ্টির জলে পুস্তক রক্ষা, শয্যারক্ষা ও কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিলাম। —সেই ভাবে বসিয়া আবার পাঠে নিবিষ্ট হইলাম।

রাত্রি অবসান-প্রায়,—আকবর আসিয়া উপস্থিত। ঝড়ে তাঁহাদের বাগানে আম পড়িতেছে বলিয়া তিনি বাটীর আরও দু চারি জন বালকবালিকার সহিত আম কুড়াইতে বাহির হন। তাহার পর আমি পড়িতেছি কিনা দেখিবার জন্য এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় বহিয়া অন্ধকারে—এই প্রায় এক পোয়া পথ আসিয়াছেন। সঙ্গে কতকগুলি পাকা ও আধ-পাকা আম। তিনি মুখে যাহাই বলুন,—আমার মনে হয়,—এই আমগুলি দিবার জন্যই তাঁহার এ সময়ে শুভাগমন।

আকবর আসিয়া আমাদের দুর্দ্দশা দেখিলেন। মা ব্যস্ত হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহার শরীরের জল মুছাইতে ব্যাপৃত হইলেন। আকবরের দৃষ্টি ও মন কিন্তু অন্য দিকে। তিনি মার হাত ও বস্ত্রাঞ্চল প্রক্ষিপ্ত করিয়া বেগে চলিয়া গেলেন।

অন্ধকার সরিয়া গেল; কিন্তু লোক জন কেহই গৃহের বাহিরে আসিল না; পাখীরাও ডাকিল না; কাকগুলাও দেখা দিল না; সূর্য্যের সুবর্ণ-করের ত কথাই নাই। সুতরাং দিবা অদ্য কোন

অভ্যর্থনা না পাইয়া ম্লানমুখে ধীরপদসঞ্চারে দেখা দিল। বায়ু তখনও গভীর ডাকিয়া, গাছের ফল পাড়িয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া, পাতা ছিঁড়িয়া, বৃষ্টিমুখে ছুটিতেছিল। সে বিভীষিকায় দৃক্‌পাত নাই—আকবর বৃহৎ এক বোঝা খড় লইয়া আমাদের গৃহদ্বারে দেখা দিলেন। মা কি বলিলেন,—আকবর শুনিলেন না; দৌড়িয়া চলিয়া গেলেন।

আমি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। কিন্তু আকবর আমার অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ; তাঁহার পল্লীর পথ,—এ বাটীর মধ্য দিয়া, ও বাটীর খিড়্‌কি দিয়া সেই পথ—তাঁহার অভ্যস্ত। আবার মুসলমানপল্লী বলিয়া আমি সর্ব্বদা সে দিকে যাইতাম না। সুতরাং আমি পৌছিবার অনেক পূর্ব্বে তিনি বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি পৌছিয়া দেখি,—তাঁহার চক্ষে তখনও জল রহিয়াছে; আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মার্জ্জন করিলেন। তাঁহার পিতা তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,—'তুই এত দিন আমাকে এ কথা বলিস্ নাই কেন?'—এই সময়ে আমার দিকে দৃষ্টি পড়িল; বলিলেন,—'তুমিই ত বাপু কুঞ্জ আচার্য্য মহাশয়ের ছেলে; তোমারই ত নাম অমর; তুমি এখানে কতবার এসেছ; তোমাদের ঘর ছাওয়া হয় নাই, খড় পাও নাই,—এ কথা আগেও আমাকে বলে নাই কেন? এই ঝড়ে, এই বৃষ্টিতে, রাত্রির আঁধারে—গাদার খড় ভাঙ্গিয়া, নিজে মাথায় লইয়া যায় কেন? গাদায় যদি সাপ থাকিত,—পথেই যদি সাপে কাটিত,—অন্ধকারে যদি পড়িয়া মরিত।'—আকবর এবার চক্ষুজলে পিতার বচন ডুবাইয়া দিলেন। তিনি বাটীর অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সিক্তবস্ত্রের জল যথাসম্ভব নিষ্কাশন করিয়া আমি আকবরের পাঠগৃহে বসিলাম।

বেলা প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত একত্র পড়িলাম। কর্ত্তার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বৃষ্টির সাময়িক বিরাম হইল। বাটীতে আসিয়া দেখি,—মা কোথা হইতে একখানি বাঁশের সিঁড়ি আনিয়া চালের উপর উঠিয়াছেন। আমি আসিয়া তাঁহাকে নামাইলাম; নিজে চালের উপর উঠিয়া যে কাজটুকু বাকি ছিল—করিলাম। আমার খাটের উপর জলপড়া বন্ধ হইল। চালের উপর হইতে নামিয়া আসিতেছি, দেখি—তিন জন লোকের মাথায় খড়, দুজনের স্কন্ধে বাঁশ; আর পশ্চাতে কতকগুলি পাকান দড়ি হাতে লইয়া আকবরের পিতা স্বয়ং আসিতেছেন। মা গৃহের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। গৃহসংস্কারের কাজ আরম্ভ হইল। আকবরের পিতা আমাদের পূর্ব্ব-অবস্থা বেশ জানিতেন; বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা যাহা না জানিতেন,—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাভারত দত্তের ভয়ে আমি সকল কথা বলিলাম না। কিন্তু সামান্য যাহা বলিলাম, তাহাতেই তাঁহার ঘোর ক্রোধোদয় হইল। শেষে বলিলেন, —'মহাভারত বড় বাড়াইয়াছে; উহাকে কন্মা পড়াইয়া না দিলে সোজা হবে না।'

সে দিন গতিকে পড়িয়া আমাদের অরন্ধন। বৃষ্টি ধরিল—দেখিয়া আমি কয়েকটি আম খাইয়া স্কুলে গেলাম। জলখাবার ছুটির সময় ললিতকে বড় ব্যস্ত দেখিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তালুকদার-তনয় সুধন্যকিশোর কথান্তর-সূত্রে ললিতের সহিত পাঁচ টাকা বাজি রাখিয়াছিলেন। ললিতের জয় হইয়াছে। বাজির টাকায় জল খাওয়া হইবে। আমার উপর ললিতের বড়ই অভিমান;—অভিমান আবার এখন কিয়ৎপরিমাণে ক্রোধ,

উপেক্ষা ও বিদ্রূপপ্রবৃত্তিতে পরিণত হইতেছিল। আজি কিন্তু জলখাবার সময় স্বাভাবিক স্নেহ প্রবল হইল। দুই চারি বার আমার দিকে চাহিলেন,—আমার নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন। শেষে অন্য দিকে চাহিয়া ঈষৎ বিকৃতস্বরে ডাকিলেন,—'এদিকে এস না।'

এতদিন দাসানুদাসের ন্যায় ললিতের পশ্চাতে ভ্রমিতাম। আজি কিন্তু তাঁহার আহ্বানে দারুণ অভিমান আসিয়া জুটিল। পণ্ডিত-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম—বাজি রাখা অনুচিত। কিন্তু বাজির টাকা খাওয়া অনুচিত কি না—বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আবার ললিতের আদেশ উপেক্ষা করি—আমার এমন কি সাধ্য। ম্লানমুখে মৃদুপদে তাঁহার অনুগামী হইলাম।

সুধন্যকিশোর কহিলেন,—'আবার ঐ দুর্ভিক্ষ-অবতার একাদশী-প্রভুকে ডাকিলে কেন? উহার আগমন হলে আর আমাদের খাওয়া হবে না।'

ললিত বলিলেন,—'কিছু খাইয়া লউক; বাড়ীতে খেতে পায় না।' আমার দিকে চাহিলেন,—একটু হাসিয়া আবার অগ্রসর হইলেন।

ললিতের মুখে এরূপ ভাবের কথা নূতন নয়। কিন্তু আজি আমার উদরে অন্ন নাই; সেই জন্য বোধ হয়, কথাটা বড় লাগিল। আমি কোন কথা না বলিয়া ফিরিলাম। দেখিলাম—আকবর আম্রতলে বসিয়া পড়িতেছেন। নিকটে আসিয়া বসিলাম। আকবর বলিলেন,—'তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; ঘর মেরামত হইতেছে বলে বুঝি রান্না হয় নাই; কিছু বুঝি খাও নাই। তোমাদের গরুর দুধ বন্ধ হয়ে বড় অসুবিধা হয়েছে, না?'

শরীর ও মনের অবস্থা, ললিত ও আকবরের কথা—সমস্ত একত্র হইয়া আমার চক্ষে জল আকর্ষণ করিল। আমি আকবরের

হাত চাপিয়া ধরিলাম; চক্ষুর জলটুকু গোপনের জন্য মুখ ফিরাইলাম। আকবর তাঁহার চাদর দিয়া আমার পরিবর্ত্তিত মুখের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

সেই আম্রতলে বসিয়া আকবরের সহিত কত মনের কথা বলিলাম। মার মনঃকষ্টের কত কথা বলিলাম। ললিতের কথা শুনিয়া আকবর বলিলেন,—'বড় মানুষের খোসামোদের ফল দেখিলে ত?'

আমি। ললিতকে ভাল বাসি। কোন প্রকার ফলের কথা কখন আমার মনে আসে নাই।

আক। যে তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, সে তোমার কাছে কিছুই নয়; আর যে তোমাকে চাহে না—

আমি। ললিত আমাকে ভাল বাসেন, ইহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। আমি তোমাকে ভাল বাসি বলিয়াই ত তুমি আমাকে ভাল বাস।

আকবর আমার হাত নিজ হস্তে লইয়া একটু বলে মর্দ্দন করিলেন। আমিও সেইরূপে উত্তর দিলাম। স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিল; আমরা পরস্পর বদ্ধহস্তে স্কুলগৃহে প্রবিষ্ট হইলাম।

ছুটির পর পণ্ডিতমহাশয়ের আমন্ত্রণ অনুসারে তাঁহার বাসায় পাঠার্থ উপস্থিত হইলাম। যথানিয়মে আমাদের জন্য কিছু আহারীয় আসিল। আকবর কহিলেন,—'পণ্ডিত মহাশয়, আমার আজি খাইতে ইচ্ছা নাই, অমরকে সব দিন।'

আমি প্রথমে আপত্তি করিলাম। কিন্তু পাছে ঘরের কথা বাহির হয়, এই আশঙ্কায় অবিলম্বে স্বীকার করিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়া দেখি—মা পাক করিয়া বসিয়া আছেন। রাত্রি হইলে তিনি আহার করিবেন না—জানি; সেই

জন্য ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মা, তোমার খাওয়া হয় নাই ?'

মা আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। তাহার পর একটু রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—'এস, খেতে বস।'

তখনও প্রদীপ জ্বলে নাই,—দেখিয়া মনে করিলাম—মা হয়ত আহার করিবেন। বলিলাম,—'মেঘে অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে, এখনও সন্ধ্যা হয় নাই।'

সত্বর ঘাটে গিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, মা আমার জন্য অন্ন পরিবেশন করিয়া রাখিয়াছেন। বলিলাম,—'মা আজি তোমার খাওয়া হইল না।'

মা তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীরভাবে বলিলেন,—'খেতে বস।'

আমি ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এই সময়ে আকবর আসিয়া উপস্থিত। আমার অর্দ্ধাশন-পরিমিতমাত্র অন্ন এবং কিছু সজিনার শাক ও লবণ আমার ভোজন-পাত্রে বিরাজমান। পার্শ্বে আকবরের আনীত সেই আম্র। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি ভোজনে বসিলাম। আকবর উঠানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মা বলিলেন,—'আকবর, তুমি বাড়ী যাও, বর্ষাকালে অন্ধকারে যাইতে নাই।'

মা অনেক বলিলেন, আকবর শুনিলেন না। সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্ধকার হইয়া আসিল। আজ বুঝি ঘরে তৈল নাই ;—মা খড় পাকাইয়া রাখিয়াছিলেন,—অগ্নিসংযোগে ফুৎকার দিয়া জ্বালিলেন ; হাতে ধরিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। আকবর বলিলেন,—'ঠাকুর কাকী, প্রদীপ জ্বালিবে না ?'

মা উত্তর করিলেন না।

আমার ব্যঞ্জন—শাক তথনও অনেকগুলি রহিয়াছে; বলিলাম,—'মা, আর দুটি ভাত দাও।'

মা বলিলেন,—'খড়ের আলো নিবিয়া যাইবে; আম খাইয়া উঠ।'

আমি বুঝিলাম। বলিলাম,—'মা, আকবরকে আজি সব বলিয়াছি।'

আকবর আর দাঁড়াইলেন না। কোন কথা না বলিয়া ত্বরিত পদে চলিয়া গেলেন। আমি মনের জড়তায় আমগুলি সব খাইয়া ফেলিলাম; মার কথা ভাবিলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি,—চারি জন মুসলমান প্রায় ছয় মণ ধান্য আনিয়াছে। দুই চারি কথার পর মা গোলার দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাহারা ধান্যগুলি গোলাজাত করিয়া চলিয়া গেল।

তিন দিন পরে মহাভারত মাতৃদেবীকে ডাকিয়া বাকি খাজানার হিসাবে একবারে ২৫৲ টাকা দিলেন। আগামী মাসে আর পঞ্চাশ টাকা দিলেই পুরাতন খাজানা শোধ হইবে—বলিলেন; এখন অবধি মাসে মাসে আট টাকা করিয়া দিবেন—ইহাও স্বীকার করিলেন।

মা বলিলেন, গত পাঁচ বৎসরে ত তিনি মোট ২২৮ টাকা পাইয়াছেন। মহাভারত তাঁহার হিসাব বাহির করিলেন। কবে কি খড় দিয়াছিলেন,—বলিলেন। গোল মিটিল না। মা শেষে মহাভারতের কথাই স্বীকার করিয়া লইলেন। একবারে পঁচিশ টাকা দেওয়াতে তাঁহার দয়া ও মনুষ্যত্বের অনেক প্রশংসা করিলেন। এই দয়া ও মনুষ্যত্বের সহিত আকবরের পিতার কোন সংস্রব ছিল কি না—বলিতে পারি না।

মহাভারতের পুত্র রামায়ণ দত্ত দেবগ্রাম স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৪।১৫ বৎসর; শরীর নাতিস্থূল, আকৃষ্ণ ও তৈল-চিক্কণ। মহাভারত টাকা দিয়া মাকে বলিলেন,—'কেবল খাজানার টাকায় তোমাদের ভাল চলে না। অমরেশ্বর বরং সন্ধ্যার পর দুই এক ঘণ্টা করিয়া রামায়ণকে পাঠ দিন। আমি মাসে দু টাকা করিয়া বেতন দিব। তাহা হইলে তোমাদের সাকল্যে মাসে দশ টাকার উপর আয় হইল;—একরূপ চলিয়া যাইবে।'

এত দিনের পর মহাভারত আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তাহাতে জননীর মন ভিজিল না। আর পাঁচ মাস পরে আমার পরীক্ষা। এখন অন্যরূপে সময় নষ্ট হইলে ক্ষতি হইবে—তাহা তিনি বুঝিতেন। আমরা মাতা পুত্রে পরামর্শে বসিলাম। মা বলিলেন,—'পঁচিশ টাকায় আমাদের পাঁচ মাস বেশ চলিয়া যাইবে। মহাভারত যদি রাগ করিয়া আর কিছু না দেন, তাহা হইলেও কষ্ট হইবে না।'

আমি। পাঁচ মাস চলিলেই ত প্রয়োজন ফুরাইল না। যদি বৃত্তি না পাই, তাহা হইলেই বিপদ। আর মহাভারত রাগ করিলে কত রূপে কত শত্রুতা সাধিবেন। আমরা হয়ত শেষে এখানে থাকিতেই পারিব না। অবশেষে আপাততঃ তিন মাসের জন্য মহাভারতের অনুরোধ রক্ষা করা পরামর্শসিদ্ধ হইল। মহাভারতও সম্মত হইলেন। পর দিন সন্ধ্যাকালে গিয়া রামায়ণের বহুবাঞ্ছিত গৃহ-শিক্ষকের পদে শুভাসীন হইলাম।

আমি মহাভারতের বাটীতে পড়াইতে গিয়াছি। অন্ধকার-রাত্রি, আকাশে মেঘমালা; বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে; বায়ু বাদল পাইয়া শীতল হইয়া মৃদুবেগে বহিতেছে। মা প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া গৃহেক

বারান্দায় শয়ানা;—শরীরের অবসাদ বশতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন,—অঘোরে ঘুমাইতেছেন। এমন সুবিধার সময় কি পাওয়া যায়!

সংসারে দরিদ্রই অধিক অত্যাচার সহে। জমিদার বল, আমলা বল, ডাক্তার কবিরাজ বল, উকিল মোক্তার বল, অর্থগৃধ্নু কুসীদজীবী বল,—দরিদ্র লোক সকলেরই নিকট সুপক্ক রসাল কদলীফল;—পুষ্টোদর লোকের সমধিক পোষণের উপকরণ। তুমি লক্ষ্মীর বরপুত্র; কোন বিপণীতে যাও — বণিক খাতিরে তোমাকে এক পয়সা সস্তা জিনিস বেচিবে। গৃহস্থের বাটীতে যাও,—সে সসম্ভ্রমে তোমার অভ্যর্থনা করিবে,— শিশুসন্তানদিগকে বঞ্চিত করিয়া দুধটুকু ও ভাল আমগুলি তোমার চরণে আনিয়া উপহার দিবে,—তোমার প্রয়োজন বা তৃপ্তি সাধনের জন্য ছুটিয়া বেড়াইবে—অন্য লোককে অনুরোধ করিবে, নিজেও ক্ষতি স্বীকার করিবে। তোমার নাকি ধন আছে, সেই জন্য সকলেরই তোমার ধনরক্ষণ ও ধনবৃদ্ধির জন্য আয়াস। আর দরিদ্র? সকলেরই আকাঙ্ক্ষা—তাহার অসীম শ্রমার্জ্জিত সামান্য ধন আত্মসাৎ করে, তাহার অপোগণ্ড সন্তানদিগকে উপবাস করায়, তাহার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি দেয়। যাঁহারা সমাজের সুসন্তান বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদেরই যখন এই ব্যবহার, তখন আলস্য ও অভাবের বরপুত্র সমাজশত্রুদিগের আর দোষ কি? যাহার ধন আছে, সকলেই তাহার সম্মান করে, তাহাকে ভয় করে। তাহাতেই ত কবিগুরু বাল্মীকির রাবণরাজকল্পনা; ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ পর্য্যন্ত নাকি তাঁহার সেবা করিতেন। আর যে দরিদ্র—তাহার কিছুতেই রক্ষা নাই। ভাল মন্দ, ছোট বড়, সকল লোক; পশু পক্ষী, ইন্দুর বিড়াল, শৃগাল কুকুর; ক্ষুদ্র প্রাণী মশা মাছি ছারপোকা পর্য্যন্ত সকলেই তাহার রক্তশোষণের জন্য ব্যস্ত। সকলেই তাহার শত্রু; তাহার অপ-

বাঁধ—সে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত। জমিদারের দৃষ্টি তাহার উপর; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গুরু-পুরোহিতের চোট সেইখানে; ভিক্ষুকেরও লোভ তাহার মুষ্টিমেয় অন্নে; দস্যুচোরেরও প্রয়াস তাহার সামান্য সম্পত্তির উপর। আজি আসিয়া তাহারা আমার কথা সপ্রমাণও করিল; সুযোগ বুঝিয়া এই সময়ে আমাদের গৃহে দেখা দিল; আমাদের ১৭টি টাকা, পরদত্ত ধান্যগুলি, এমন কি জননীর ও আমার নূতন ও পুরাতন সামান্য বসন এবং আমার নবলব্ধ ছাতিটি পর্য্যন্ত চুরি করিয়া লইয়া গেল।

মা বলিলেন,—'আমাদের ত আপাততঃ চলিবার উপায় হইয়াছিল। কিন্তু অর্থে অর্থলোভ বাড়িল। তুমি নিতান্ত বালক, আবার এই আসুরিক পরিশ্রম করিতে হয়; তাহার উপর তোমাকে উপার্জ্জনে নিযুক্ত করিলাম,—মা হইয়া এই নিষ্ঠুর কাজে অনায়াসে মত দিলাম। তাহাতেই হাতে হাতে এই শাস্তি হইল।'

আমি। বৃত্তি পাওয়া বুঝি আমার ঘটিল না। কেবল বিঘ্নের উপর বিঘ্ন।

মা। বৃত্তি অবশ্যই পাইবে। সংসারের দিকে তোমার দেখিয়া কাজ নাই। তোমার কাজ তুমি কর। বিপদ, বিঘ্ন, বাধা—সমস্তই পরীক্ষার জন্য, যোগ্যতার পরিচয় এবং উন্নতিলাভে অধিকার নির্ণয়ের জন্য। এইরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই জয় লাভ হয়।

আমি বুঝিলাম। কিন্তু মহাভারত ভিন্ন এখন আমাদের গত্যন্তর নাই। সুতরাং রামায়ণের পণ্ডিতের পদ খালি হইল না। মহাভারতের বাটীতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া যাইত। তিনি স্বয়ং পাঠস্থানে বসিয়া থাকিতেন,—না উঠিলে নিদ্রালু পুত্রেরও অব্যাহতি

নাই,—আমারও ছুটি নাই। এতদিন রাত্রিতে চারি ঘণ্টা ঘুমাইতাম; এখন কমাইয়া তিন ঘণ্টা করিতে হইল।

রোগও বোধ হয় দরিদ্রের শত্রু। নতুবা এই সময়ে উদরাময় ও আমাশয়-পীড়া দেখা দিয়া বাদ সাধিল কেন? ভোজন সুখের লালসা ত সকলেরই আছে;—তবে যেখানে ভাল খাইতে পায় না—রোগ সেখানে যায় কেন? নিরুদ্বেগে বাস মিলে বলিয়াই বোধ হয়, দরিদ্রের শরীরের উপর রোগের এত চোট। সাধারণ নিয়মানুসারে আমার শরীরেও দশ-সালা বন্দোবস্ত লইয়া বসিল। আজিও তাহার হাতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই নাই।

পরীক্ষার সময় নিকট হইতে লাগিল। এখন আমাদের একরূপ যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র-প্রথিত ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরাদি প্রধান যোধগণের ন্যায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্মানবুদ্ধি বা মায়া মমতা থাকিলেও জিগীষা জন্মিয়াছিল। জিগীষা উন্নতি-কামনার অন্তর্ভূত। উন্নতি-কামনা ও প্রণয়ই জগতে সর্ব্বকার্য্যের মূল। এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল, তৎসম্বন্ধে বড়ই মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন—প্রবৃত্তি দুটি পরস্পর বিরোধী; কাহারও মতে প্রণয়—বালকের স্বপ্ন, স্ত্রীলোকের আব্দার, দুর্ব্বলের দোহাই দিবার স্থান,—প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ অলীক; আর উন্নতি-কামনা ও তদানুষঙ্গিক উৎসাহই জগতের কার্য্য নিয়মিত করে। আমি কিন্তু এই মত সত্য বলিয়া মনে করি না। আর এই দুই প্রবৃত্তি যে মূলতঃ পরস্পর বিরোধী, তাহাও মনে হয় না। অনেক স্থলে উভয় প্রবৃত্তিই কার্য্য মূলে থাকে। তবে আমার সম্বন্ধে যেন বিরোধ অনুভব করিলাম,—মনের মধ্যে উভয় প্রবৃত্তির দ্বৈরথ যুদ্ধ হইতেছে—বোধ হইল। মনকে বুঝাইতে গেলাম। মন যেন হাসিল; বুঝি—বুঝিল না।

পরীক্ষার ভীষণ দিন আসিল। বিদ্যালয়-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর বাবু আসিলেন; অধ্যক্ষ মাধববাবু এবং মেম্বরগণও আসিলেন। ললিত বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া দেখা দিলেন। সঙ্গে অনেকগুলি ধনী লোকের সন্তান। তাঁহার কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য নাই। সুন্দর উপেক্ষা-রঞ্জিত মুখমণ্ডলে চিন্তার মালিন্য-রেখা যেন একটু দেখা দিয়াছে। নয়নে সেই অবজ্ঞামিশান সহাস্য দৃষ্টি নাই; চঞ্চল অপ্রসন্ন ভাব যেন সেই মনোমোহন নয়নের মধুরিমা সরাইয়া দিয়াছে। ললিতকে দেখিয়াই যেন বুক ভাঙ্গিয়া গেল;—আপনাকে সহস্র অপরাধী মনে করিলাম; ভাবিলাম,—যে ললিতের চরণবিদ্ধ কণ্টক দন্তে তুলিয়া দিলে মনের শান্তি হয়, যাহার চরণে কঠিন-মৃত্তিকা-সংঘর্ষণ ক্লেশ নিবারণ জন্য নিজের বুক পাতিয়া দিতে পারি—আজি আমার জন্য সেই ললিতের এই মনঃপীড়া! এক বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গেলে ললিতের এই কষ্ট হইত না।

ললিতকিশোর বিমনস্কভাবে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—'অমর, তুমি খুব পড়িয়াছ; তুমিই বৃত্তি পাইবে।'

আমি সাগ্রহে ললিতের দক্ষিণ হস্ত দুই হাতে ধরিয়া বলিলাম,—'আমার বৃত্তিতে কাজ নাই; তুমি বল, আমি চলিয়া যাইতেছি।'

ললিতকিশোরের যেন চমক ভাঙ্গিল, একটু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন,—'আমি তোমার নিকট দয়া চাহিতে আসিয়াছি না কি? যত দূর সাধ্য করিয়া দেখ, তোমরা যতই কর না—ললিতকিশোর সকলের উপর হইবেন।'

আমি মর্ম্মাহত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একবার ভাবিলাম—চলিয়া যাই। আবার মার কথা মনে পড়িল; আমার পা উঠিল না।

আকবর আমার পার্শ্বে আসিয়া পশ্চাৎ-মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন,—আমি দেখি নাই। ললিত চলিয়া গেলে আমার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন,—'কেমন অমর, বড় মানুষের খোষামোদ করিয়া কি পাইলে? ললিত বৃত্তি পাইলে লইবেন না; তোমাকে দিবেন।'

আমি বিরক্ত হইলাম; নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলাম;—আকবর চলিয়া গেলেন। ললিতের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে জিগীষা আসিয়া দেখা দিল।

আমি প্রথমে ইন্‌স্পেক্টর বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি নাই। আমি একে ক্ষুদ্রকায়; দশ-বর্ষীয় হইলেও আমাকে অষ্টবর্ষীয়ের ন্যায় দেখাইত। তাহার উপর সাজিমাটি-সংযোগে ধৌত ধুতি ও চাদর এবং এক জোড়া পীতবর্ণের নূতন চটিজুতা—এই আমার সমগ্র বসন ভূষণ। সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর বাবুর দৃষ্টি আমাতে পড়িবে কেন? শেষে কলম-হস্তে আমাকে পরীক্ষাস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন,—'এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিও পরীক্ষার্থী না কি?'

অধ্যক্ষ মাধববাবু কহিলেন,—'পণ্ডিত মহাশয়ের বৃথা আকিঞ্চন।'

একজন সভ্য কহিলেন,—'অনর্থক আপনাকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। ও বালক পরীক্ষা দিতেও পারিবে না। লাভের মধ্যে আপনাকে এক প্রস্থ কাগজ বেশি দেখিতে হইবে।'

ইন্। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বালকটিকে পরাজয়-ক্লেশ দিয়া মনোভঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি?

আমি নির্দিষ্ট আসনে বসিতে যাইতে ছিলাম। ইন্‌স্পেক্টর বাবুর কথা শুনিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না; যেখানে ছিলাম,—সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মাধববাবু বলিলেন,—'আমারও সেই অভিপ্রায়। বরং এবার ভাল করিয়া পড়িলে আগামী বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।'

ইন্‌স্পেক্টর বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'তুমি বাপু, বাড়ী যাও; ভাল করে পড়া শুনা কর। আগামী বৎসর পরীক্ষা দিবে।'

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেক সময়, অনেক বার অনেক যন্ত্রণা দায়ক অবস্থায় পড়িয়াছি; অনেক অপমান, অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াছি; কখনই আমার এরূপ মাথা ঘুরিয়া যায় নাই—চারিদিক ধূমময় দেখি নাই। আমার জীবনে এ ভাব এই নূতন। কত লোকে কত ভাবে কত কথা বলিলেন,—শুনিলাম না; চলিতেও পারিলাম না;—স্থাণুর ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে পণ্ডিতমহাশয়ের কথায় চৈতন্য হইল। তিনি বাহিরে ছিলেন; এখন আসিয়া বলিলেন,—'অমরেশ্বর দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?—তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে যাও; ভয় পাইয়াছ না কি?'

আমার প্রাণ যেন শরীর ছাড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতমহাশয়ের কথায় আশ্বাস পাইয়া যেন ফিরিয়া আসিল। শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

পণ্ডিতমহাশয় বড় তেজীয়ান্ পুরুষ। অধ্যক্ষ মাধববাবুও তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে কি বলিতে ছিলেন;—পণ্ডিতমহাশয়ের আগমনে তাঁহার কথার মধ্যেই দাঁড়ি পড়িয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'এই শিশুটিকে কেন অনর্থক উৎসাহ-ভঙ্গের যন্ত্রণা দিতে আনিয়াছেন। শুনিলাম—ছেলেটি কিছুই জানে না। বরং যাহাতে ভাল করিয়া

শিখে—সেই দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। কেবলমাত্র দারিদ্র্যের অনুরোধে ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া যায় না।'

আমার মনে হইল—আর পরীক্ষায় কাজ নাই; লেখা পড়া, পরীক্ষা, ছাত্রবৃত্তি আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের জন্য নয়।

পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন,—'ছেলেটি যত্নপূর্ব্বক পড়িয়াছে; পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইবে। আর এই বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আমাদেরও গৌরবের কথা। তবে দীনদুঃখী বলিয়া পরীক্ষা দিতে না দেন,—সে স্বতন্ত্র কথা।'

একজন মেম্বর বলিলেন,—'ছেলেটি পণ্ডিতমহাশয়ের বড় প্রিয়। উঁহার ইচ্ছা—ছেলের হইয়া নিজেই পরীক্ষা দেন।'

মাধববাবু বলিলেন,—'গরিবের ছেলের উপর লোকের দয়া ত হইবারই কথা। বিশেষতঃ পণ্ডিত মহাশয়ের মত ভাল লোকের।'

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন,—'ভাল, ছেলেটি পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে; পণ্ডিতমহাশয়ও উপস্থিত। পরীক্ষা হউক। তবে আমার ত মনে হয়—পণ্ডিতমহাশয় আমার উপর বাদ সাধিতেছেন। বিশেষতঃ প্রশ্নগুলি এবার বেশ কঠিন হইয়াছে।'

দুই দিন ধরিয়া পরীক্ষা হইল; তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরের সময় ইন্‌স্পেক্টরবাবু স্কুলে আসিয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিলেন।

	সাহিত্য ব্যাকরণ	পাটীগণিত জ্যামিতি	ইতিহাস ভূগোল	প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান	সংখ্যা-সমষ্টি
পূর্ণ সংখ্যা	১০০	১০০	১০০	১০০	৪০০
ললিতকিশোর রায় চৌধুরী	৮৯	৭৪	৭৯	৯০	৩৩২
আকবর তালুকদার	৮০	৬৬	৯৫	৯১	৩৩২
[illegible]রেশ্বর আচার্য্য	৭৯	৯২	৭৫	৮৮	৩৩৪

স্কুলের অধ্যক্ষ ও সভ্যগণ নীরব। সমবেত ছাত্র ও দর্শকগণ নীরব। সেই বৃহৎ গৃহমধ্যে একটি তৃণপাত-শব্দ হইলেও শুনা যায়। পণ্ডিতমহাশয়ও নীরব, কিন্তু তাঁহার মুখে যেন একটা আনন্দজ্যোতিঃ দেখিতে পাইলাম। আমি প্রথমে ভয়, বিস্ময়, লজ্জা ও হর্ষ মিশ্রিত এক নূতন ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া সে ভাব সরিয়া গেল।

পিতা মাতা সকল সন্তানকেই ভাল বাসেন। সকল সন্তানের উপরই তাঁহাদের সমান স্নেহ, সমান দয়া হওয়া উচিত;—সাধারণতঃ সেই রূপই দেখা যায়। কিন্তু নিপুণভাবে দেখিলে অতি চতুর, অতি বুদ্ধিমান জনক জননীরও সন্তানবিশেষে পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন—আমাদের স্বর্গীয় পিতা মাতার সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম; প্রত্যক্ষ পার্থিব জনকজননী সেই পরোক্ষ স্বর্গীয় জনক-জননীর অংশমাত্র; শাখা ও মূলবৃক্ষের ধর্ম্ম ত স্বতন্ত্র নয়;—আর সেই জন্যই নাকি সংসারে এত ইতর-বিশেষ! এ কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা আমি জানি না; বিশেষতঃ আমার যখন ভাই নাই, তখন ও কথা আমি বুঝিব না। কেহ কেহ বলেন,—এক এক পিতামাতার এক একটি মাত্র সন্তান হইলে সংসার কত সুখের হইত। আবার অন্যেরা বলেন—তাহা হইলে কে শ্রীরামচন্দ্রের অরণ্যবাস-সহচর হইত; রাজরাজেশ্বর যুধিষ্ঠিরেরই বা কি অবস্থা ঘটিত? এই একটা স্থূল কথা সপ্রমাণ করিবার জন্যই নাকি রামায়ণ-মহাভারতের সৃষ্টি। আমার কিন্তু মনে হয়—এই বিষয়ের সুমীমাংসা সদ্বুদ্ধি ও সৎশিক্ষার উপরই নির্ভর করে। ললিতকিশোরকে ছাড়িয়া আকবরকে আদর্শ করিতে পারিলে ব্যক্ত হয়; তবে মন যে ললিতকিশোরের দিকে ধায়।

এসব বাজে কথায় আমার কি অধিকার—জানি না। তবে একটা ছুতা পাইলেই আমার কথার স্রোত ছুটে। এটা আমার স্বভাবদোষ।

পিতা মাতা সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম—শিক্ষকসম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের সকল ছাত্রের উপরই ত সমভাব; তবে পরীক্ষার ফল শুনিয়া তাঁহার মুখে এরূপ জ্যোতিঃ কেন? তাঁহার চক্ষু দেখিলেই বোধ হয়—যেন মনের ভিতর আনন্দ ধরিতেছে না।

পরীক্ষায় ললিত এক বিষয়ে প্রথম ও তিন বিষয়ে দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। অধ্যক্ষ ও সভ্যগণের বিবেচনায় শেষে স্থির হইল—ললিতের পরীক্ষার ফলই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়মতে ছাত্রবৃত্তি তাঁহারই প্রাপ্য।

এ কথা লিখিয়া পড়িয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে জানান হইল। অনেক অনুরোধ উপরোধও পড়িল। একটা বড় ঘরের অপমান হয়,—এ কথাটাও উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু পণ্ডিতমহাশয়ের অভিপ্রায় চাহিলেন। তিনি বলিলেন,—'সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ধরিয়াই ত পরীক্ষার ফল নির্ণয় হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তিনি আর অধিক কি বলিবেন। আরও—ললিত এক বিষয়ে প্রথম, এবং তিন বিষয়ে দ্বিতীয় হইয়াছেন। আকবর দুই বিষয়ে প্রথম, এক বিষয়ে দ্বিতীয় এবং এক বিষয়ে তৃতীয় হইয়াছেন। এই দুই বালকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কাহার—ইহাই বা কিরূপে নির্ণয় হইবে।

অধ্যক্ষ ও সভ্যগণ বেগতিক দেখিয়া বলিলেন,—তবে আকবর তালুকদার ছাত্রবৃত্তি লাভ করুক।

আকবর অধ্যক্ষের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—'আমি এত পরিশ্রম করিয়াও যখন পরীক্ষায় প্রথম হইতে পারিলাম না, তখন আমার বৃত্তি পাইতে কি অধিকার? কেবল অনুগ্রহ-লব্ধ বৃত্তি আমি লইব কেন?'

আকবরের এইরূপে কথা বলা বড়ই নিয়ম-বিরুদ্ধ হইল। কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর বাবু বিরক্ত হইলেন না;—আকবরের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

একটা অনিয়ম চালাইলে আর একটা প্রায়ই আইসে। ললিত উঠিয়া বলিলেন,—'তবে আমিই বৃত্তি পাইব।'

ললিতকিশোরের বাটীতেই ইন্‌স্পেক্টর বাবুর বাসা। তাঁহার পিতা সগণে তাঁহার সেবা করিতেছেন। ললিতের সুন্দর মূর্ত্তি তাঁহারও নয়ন আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় ললিত আব্দারের সহিত কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—পাছে তাঁহার আব্দার না থাকে,—পাছে সকলের, বিশেষতঃ আকবরের সম্মুখে অপমানিত হন। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, এই ভয় তাঁহাকে অভিভূতপ্রায় করিল।

ললিতের মুখ দেখিয়া প্রাণে বড়ই বেদনা পাইলাম। আমিই তাঁহার যন্ত্রণার মূল। আমি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র সামান্য কীট,—কুমার-কল্প ললিত কিশোরের অভীষ্টলাভের অন্তরায়!—কলের পুত্তলীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দুই হস্ত যুক্ত করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম,—'আমি বৃত্তি-লাভের উপযুক্ত নই। ললিত কিশোরের ন্যায়-প্রাপ্য বৃত্তি তাঁহাকেই দিন।'

আমার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল;—বসিয়া পড়িলাম।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু স্তব্ধপ্রায় হইয়াছিলেন;—আমাদিগকে নিবারণ বা তিরস্কার করিলেন না। মেম্বর ও দর্শকগণ নানা কথায় হট্টগোল তুলিলেন। সকলেই তর্কে প্রবৃত্ত। পণ্ডিতমহাশয় 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্'—একভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কেবল এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়নপ্রান্তে। ইন্‌স্পেক্টর বাবু এই সময়ের মধ্যে লিখিয়া পড়িয়া ঠিক করিলেন। তাঁহার হস্তসঙ্কেতে কিয়ৎপরিমাণে গোল থামিল। তিনি বিজ্ঞাপনী পাঠ আরম্ভ করিলেন। কিয়দংশ পাঠ হইয়া গেলে গোল একবারে নিবৃত্ত হইল। তখন আমি তাঁহার কথাগুলি শুনিতে ও বুঝিতে পারিলাম। তিনি পরীক্ষার প্রণালী ও ফল সম্বন্ধে—এবং পণ্ডিত মহাশয়, অধ্যক্ষ ও সভ্যগণের কথা তুলিয়া কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন। শেষে আমাদের তিন জনের কথা। সে সমস্ত কথা আমার হৃদয়ঙ্গম নহে,—সুতরাং বলিব না।

মন্তব্যের শেষভাগে বৃত্তি দানের কথা। ইন্‌স্পেক্টর বাবু ছাত্রবৃত্তিটি আমাকেই দিলেন। আর লিখিলেন,—তাঁহার অধীনস্থ কোন স্থানে উপযুক্ত পাত্রাভাবে এই বৎসর যদি কোন বৃত্তি খালি পড়ে, তাহা হইলে আকবর তালুকদারও একটি বৃত্তি পাইবেন।

ইন্‌স্পেক্টর বাবুর মস্তকে পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক,—তাঁহার নাম ও যশঃ অক্ষয় হউক,—একমাস পরে পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট সরকারি চিঠি আসিয়াছিল যে আকবরও ঐরূপ একটি বৃত্তি পাইয়াছেন।

ছাত্রবৃত্তির নিয়ম অনুসারে আমি চারি বৎসর কাল মাসিক চারি টাকা করিয়া পাইব। সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাল পর্য্যন্ত যে কোন সরকারি বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়িবার অধিকারও

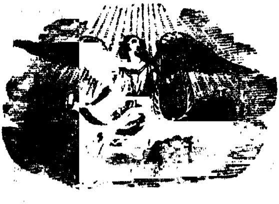
হইল। আমাদের অবস্থা অনুসারে ধরিলে ছাত্রবৃত্তিটি আমাদের পক্ষে একটি বড় চাকরি বলিলেও চলে।

বৃত্তিলাভের সংবাদ লইয়া মার নিকট আসিলাম। মা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণের পর বলিলেন,—'আজ তিনি থাকিলে কতই সুখী হইতেন।'

মার কথায় পিতৃদেবের চিন্তা,—কত চিন্তা আসিল। আমরা দুজনে মুখামুখি হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। রাত্রি হইয়া গেল, ঘরের দীপ জ্বলিল না; মা আমার জন্য অন্ন পাক করিতেও উঠিলেন না। আমরা নীরব-কথোপকথনে পরস্পরের মনের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কি এক-প্রকার অপূর্ব্ব দুঃখ-মিশ্রিত আনন্দে মন পূর্ণ; ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলাম; বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব ভুলিলাম। সেই দিনের, সেই সময়ের—সেই সুখ-দুঃখ-মিশ্রণ-সঞ্জাত মধুরতা, আজিও মনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কত দিন পাতিত-জানু হইয়া যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের নিকট কাতরহৃদয়ে প্রার্থনা করিয়াছি—যেন মুহূর্ত্তের জন্যও সেই ভাব পাই,—ক্ষণকালের নিমিত্তও যেন সেই অপূর্ব্ব মধুরিমার—সেই স্থান—সেই ঘর—সেই চিত্র—সেই সন্ধ্যা—সেই ঘটনা—সেই জননী—সেই আমি—সেই অসীম সুখ ও প্রগাঢ় দুঃখের অসম-মিশামিশি-সঞ্জাত অব্যক্ত মধুরতার উপভোগ আবার আমার ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু আমার কামনা আর পূরিল না।

আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস। মা বলিলেন,—'পরমেশ্বর তোমার উপর মুখ তুলিয়া দেখুন। আমি দেখিতে পাইব কি না—জানি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে—ভগবানের বিধানে অন্যায় নাই, ভ্রম নাই; আমি নিশ্চয় জানি—তুমি তোমার পৈতৃক সম্পত্তিগুলির

পুনরুদ্ধার করিবে। তিনি বড় সাধ ক'রে,—একরূপ নিজের হাতে করিয়া বড় বাগান দুটি করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—'যদি তাঁহার ভাগ্যে ফলভোগ না ঘটে, আমিরেশ্বর খাইলেই তাঁহার তৃপ্তি হইবে।' তালুক যাওয়াতেও আমার তত কষ্ট হয় নাই; কিন্তু বাগান দুটি যাওয়াতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।'



দ্বিতীয় খণ্ড।

১

আমি শ্রীআকবর তালুকদার,—পিতার নাম ৺ মমরেজ তালুকদার। বর্ত্তমান বাসস্থান—কলিকাতা। আমার স্বজাতীয়-গণ নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ যোগ করেন না। বলেন—উহা হিন্দুদের প্রথা। আমি বলি—বিশ্রী বা শ্রীহীন হইবার জন্য দেশীয় প্রথা ছাড়িবার প্রয়োজন কি? আমরা হিন্দু-মুসলমান—এক দেশে একত্র বাস করি,—এক ধাতু, এক উপাদানে গঠিত। আমার বিপদে আমার বন্ধু অমরেশ্বরের যেরূপ কষ্ট হইবে, আরব-দেশবাসী কাসিম খাঁর প্রাণে কি সেরূপ বাজিবে?

মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগও আমাদের জাতীয় প্রথা নয়। আবার কেহ কেহ বলেন,—মানুষ কখনই ঈশ্বর হইবে না। মানুষের নামের সহিত ঈশ্বর-শব্দ যোগ করিলে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার অবমাননা করা হয়;—পাপ হয়। আমি জানি—আমার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহার মত সাধু, পবিত্র, পর-হিতব্রত লোকের বাসজন্যই ত ঈশ্বরের স্বর্গসৃষ্টি। মানুষ ঈশ্বর হইতে পারে না, সত্য;—কিন্তু চুম্বক-সংসর্গে হীনধাতু লৌহও ত

তদ্ধর্ম পায়। আমার পিতাও স্বর্গে ঈশ্বর-সহবাসে আছেন।—বিশেষতঃ আমার জীবন তাঁহার নিকটেই লব্ধ;—তাঁহাকে ঈশ্বর-স্বরূপে ভাবিতে মনে কতই তৃপ্তি হয়। সেই জন্য এই প্রথাটিও আমি গ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ হিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া, আর অমরেশ্বরের নিকট সংস্কৃত শিখিয়া আমি হিন্দু ভট্টাচার্য্যের মত বলিতে, লিখিতে ও ভাবিতে শিখিয়াছি। আবার তাহাতেই বোধ হয়, অমরের অসম্পূর্ণ লেখা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমার এই সাহস।

আমার বয়স এখন চব্বিশ বৎসর। আমাদের জেলার স্কুলে পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি;—এই দুই বৎসর কলিকাতায় মেডিকাল কালেজে চিকিৎসা বিদ্যা শিখিতেছি। সহরের মধ্যে মামার বাটীতেই থাকি। তাঁহার বাড়ীও পূর্ব্বে আমাদের দেশে, আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ দূরে ছিল। এখন দেশ ত্যাগ হইয়াছে; উলুখড়ের ছাওয়া ঘরগুলি সংস্কারের অভাবে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সেও অনেক দিনের কথা। মামা আমার মাকে বড় ভাল বাসিতেন। পিতার সহিতও তাঁহার আন্তরিক সখ্য ছিল। সেই কারণে দুই এক বৎসর অন্তর মামী-মাকে সঙ্গে লইয়া দেশে আসিতেন; আমাদের বাড়ীতেও দুই চারি দিন আসিয়া বাস করিতেন। মামা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। মামী-মার সম্পর্কেই তাঁহার কলিকাতায় বাস। সহরে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে বেশ উপার্জ্জন হয়—মামারও হইত। কলিকাতায় তাঁহার তিন খানি বাড়ী। এক খানিতে নিজের বাস; আর দুই খানি হইতে মাসে তিন শত টাকা ভাড়া আইসে। সংসারে ব্যয়ও যথেষ্ট। দাস দাসী ও আত্মীয়

বাটীতে অনেকগুলি। তাহার উপর আতর গোলাবের একরূপ ছড়াছড়ি।

তিন বৎসর হইল পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সংসারে আমার এখন অভিভাবক কেহ নাই। ভৃত্যবর্গের উপরেই নির্ভর,—তাহারা মামার নিকট হিসাব নিকাশ দেয়। তিনিই এখন আমার অভিভাবক।

মামার সন্তানাদির মধ্যে একটিমাত্র কন্যা—দিলজান। শৈশবাবধিই আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম। বাল্যকালে মামী-মার সহিত দিলজান অনেকবার আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন। আমরা একত্র খেলিতাম—একত্র ভ্রমিতাম, বসিতাম, খাইতাম, ঘুমাইতাম। বয়সে আমার অপেক্ষা দু তিন বৎসরের ছোট হইলেও তাহার সহিত সমবয়স্কভাবে খেলাধূলা করিতে আমার বাধা হইত না। আমি পল্লীগ্রামে থাকিতাম,—দিলজান সহরের মেয়ে; আমার অপেক্ষা চালাক চতুর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সভ্য ভব্য;—চাল চলনে, বসন ভূষণে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।—দেখিতে শুনিতে ভাল, কথাবার্ত্তায় ভাল,—পড়া শুনাতেও আমার অপেক্ষা হীন নহে। এই সকল কারণে তাহার উপর আমার একটা ভয়-বিস্ময়-ভক্তি মিশান প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। দিলজান কলিকাতার কত বড় লোকের কথা বলিতেন;—কত অদ্ভুত ঘটনা, কত বিচিত্র চিত্র, কত নূতন রঙ-তামাসার কথা বলিতেন; কত সাহেব-সুবা, নবাব-ওমরা, রাজা-রাজড়ার কার্য্য কলাপ বর্ণন করিতেন; কত লোমহর্ষণ কাণ্ড, কত কল্পনাতীত বিষয়ের সংঘটন কথা তাঁহার স্বভাব-কোমল, সহজ ভাষায় বলিতেন।—আমি বসিয়া শুনিতাম,—শুনিয়া স্তম্ভিত হইতাম। আমার

ভাব দেখিয়া বোধ হয় দিলজানের কল্পনা ও বচনের স্রোত অধিক ছুটিত। কোন কোন সময়ে বুঝিতে না পারিয়া বা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতাম। সেরূপ সময়ে দিলজান কখনও তাঁহার সেই মনোমোহন হাস্য-মিশ্রিত কথায় বুঝাইয়া, কখনও তাঁহার জননীকে স্বাক্ষী মানিয়া, কখন মামার দোহাই দিয়া, কখন বা উপহাস করিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন। তাঁহার উপহাসে অবজ্ঞা বা আত্মগরিমার গন্ধ পাইতাম না—তাহাতে আমার নিজের হীনতাও বলিয়া দিত না। সুতরাং সে উপহাসে মর্ম্মপীড়া আসিত না;—বরং আনন্দ হইত। দিলজানের সম্বন্ধে বাল্যকাল এইরূপে কাটিয়াছে। ক্রমে উভয়েই বড় হইলাম—তখনও প্রায় সেই সম্বন্ধ। প্রভেদের মধ্যে আমার পুরুষোচিত এবং দিলজানের স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা অধিক হইতে লাগিল। আমি আবার জেলার সহরে থাকিয়া পৃথিবীর সংবাদ অনেক রাখিতাম;—সময়ে সময়ে দিলজান শ্রোতা এবং আমি বক্তার আসন গ্রহণ করিতাম। ইহাতে কিন্তু এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। যে প্রণালীতে লেখা পড়া করি, তাহাতে অনেক শাস্ত্রে দৃষ্টি পড়িয়াছে; কিন্তু একটিও উদরস্থ করিয়া পরিপাক করিতে পারি নাই; সুতরাং তন্মূলক বল-সংগ্রহও ঘটে নাই। কোন শাস্ত্রের আস্বাদন, কোনটির আঘ্রাণ-মাত্র লইয়াছি। অধীত শাস্ত্রের বর্ণনাকালে সে গুলির উল্লেখ হইয়া পড়ে; অথচ নাম করিয়া তৎসম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতাম না। কখন দুজনে তর্ক বিতর্ক করিতাম; মীমাংসা না হইলে মামার মধ্যস্থতা আছে। এইরূপে আমাদের বিদ্যা বাড়িয়া চলিল; সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের উপর মায়াও বাড়িয়া চলিল।

২

অমরেশ্বর ও ললিতকিশোর দুজনেই এখন কলিকাতায়। অমর বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। আমি ও অমর দুজনেই পটোলডাঙ্গায় পড়ি। সুতরাং আমাদের আবাসস্থান একটু দূরবর্ত্তী হইলেও প্রায় প্রত্যহই পরস্পর দেখা হইত। কোন দিন কালেজে দেখা না হইলে অমর আমাদের বাড়ীতে আসিতেন; বৈশাখের রৌদ্র, জ্যৈষ্ঠের ঝড়, শ্রাবণের বৃষ্টি, পৌষরাত্রির শীত—কিছুতেই বাধা হইত না।

অমর বরাবর বৃত্তি পাইয়া পড়িতেছেন। আবার প্রায়ই লোকের বাটীতে গৃহশিক্ষকের কাজ করেন। তথাপি কখন তাঁহাকে দুটি পয়সা ব্যয় করিয়া জল খাইতে দেখি নাই। অমর কখন কোন সহাধ্যায়ী বা অন্য লোকের বাটীতে নিমন্ত্রণেও যান না। এই রূপ আত্মবঞ্চনার জন্য আমি তাঁহাকে সময়ে সময়ে তিরস্কার করিতাম; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিষণ্ণতা-উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোন ফল হয় না দেখিয়া এখন বুঝিয়াছি—তিনি মন্ত্রৌষধের বাহিরে গিয়াছেন।

ললিতকিশোর হিন্দুস্কুলে পড়েন। বড় মানুষের ছেলে। কলিকাতার অনেক ধনি-সন্তান সহচর। মাথার মধ্যস্থলে সীঁথা দিয়া, ভাল পরিচ্ছদ ও মণ্টিথের বাড়ীর বার্ণিস্ করা জুতা পরিয়া স্কুলে আসেন;—পান খান, গান করেন, টেবিল বাজান,—হাসেন, উপহাস করেন,—আমোদে থাকেন। চক্‌চকে বইগুলি পাছে ময়লা হয়, এই ভয়ে প্রায় খুলেন না।

আমরা ছাত্রবৃত্তি পাইয়া জেলার স্কুলে পড়িতে গেলাম। ললিত কেন দেশে পড়িয়া থাকিবেন। তিনি আমাদের উপর টেক্কা দিবার জন্ম একবারে কলিকাতায় পড়িতে চাহিলেন। তাঁহার পিতা সম্মানাভিমানী প্রাচীন লোক। ছোট লোকের ছেলেদের সহিত

পড়িতে হইবে না—বলিয়া ললিত পিতার নিকট ধনি-সন্তানগণ-সেবিত সকলের বড় স্কুলে পড়িবার জন্য আব্দার করিয়া বসিলেন। তালুকদারের পারিষদ্‌গণ সেই আব্দারের প্রশংসা গাইলেন। ললিতের জয় হইল। আমরা জেলায়—পল্লীগ্রামে—পড়িয়া রহিলাম; ললিত কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াই রক্তহীন অমর ললিতের পদাশ্রয় লইলেন। আমি পরবৎসর কলিকাতায় আসিয়া তাহাই দেখিলাম। তিন চারি দিন বড় বড় ডাক্তারি বই হাতে লইয়া, হিন্দুস্কুলের সম্মুখ দিয়া, শিরোবেষ্টনে নাসিকা ভ্রমণপূর্ব্বক বাসায় আসিলাম। সকল সময়েই বিদ্যালয়-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, লোহার বেড়ার পার্শ্বে ললিতের অধিষ্ঠান। এক দিন সম্মুখে গিয়া উন্নতমস্তকে, হস্তস্থিত পুস্তকগুলির সুবর্ণাক্ষর বাহির করিয়া দাঁড়াইলাম। ললিত তাঁহার সেই পুরাতন হাসি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'কেমন চাচাজি, —অমরের মুখে শুনিলাম—তুমিও নাকি পাশ পেয়েছ? এখানেও অমর তোমার হইয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াছিল নাকি?'

আমি রাগ সাম্‌লাইয়া বলিলাম,—'তুমি কেমন আছ?' আমার এত ভাল মানুষি কেবল অমরের খাতিরে।

ললি। আমি বেশ আছি। টাকা থাকিলে এখানে খুব ভাল থাকা যায়। আর কলিকাতা আমার কাছে নূতন নয়। তুমি সহর নূতন দেখিলে;—বল দেখি, কি রকম বোধ হয়? এখানে তোমার কোঁচাও নাই, আউসও নাই, ছেলে বলদগুলিও নাই। সঙ্গী ফেলিয়া থাকিতে পারিবে ত?

আমি। এখানে লেখাপড়া শিখিতে আসিয়াছি। ময়ূর সাজিয়া ময়ূর সঙ্গীর অন্বেষণে আসি নাই।

ললি। আমরা হইলাম—ময়ূর; আর তুমি বুঝি—কোকিল। ওরে আমার বসন্তের কোকিল,—একবার কুহু ডাক ত ?

আমি চলিলাম। ললিত ডাকিলেন,—'ওহে তালুকদার, রাগ করে যাও কেন? অনেক দিনের পর দেখা হল; এস, একটু ভাল করে কথা কয়ে যাও।'

আমি ফিরিলাম। ললিত বলিলেন,—'এস এস, তালুকদার এস!—রাগ করেছ?—তুমি হলে তালুকদার; কাজে না হয়, নামেও বটে। তুমি রাগিলে আমরা সব প্রজাপাঠকের দল যে মারা যাব। ভাল, বল দেখি,—পচা মড়া কাটিছ কেমন? ঐ জিনিসটা তোমাদের বড় প্রিয়,—না?

আমি। বিদ্যা শিখিতে গেলে বাবুয়ানা ছাড়িতে হয়, ঘৃণা ছাড়িতে হয়—

ললি। আহে—আমি কি নিষেধ করি; তুমি খুব পচা মড়া কাট। তুমি পাশ করে বাহির হয়ে দেশের লোকের ফোঁড়া কেটে বেড়াবে। আমিও তোমাকে বাড়ীতে অবৈতনিক ডাক্তার নিযুক্ত করিতে পারি। তাহাতে তোমার নাম বাহির হইবে, পসার বাড়িবে। আর সঙ্গে সঙ্গে যদি নরসুন্দরের কাজটাও লইতে পার, তা হলে আর পেটের ভাতের জন্য লাঙ্গল ধরিতে হবে না। আমি তোমাকে সার্টফিকেট দিব। তাহার উপরে লেখা থাকিবে,— আক্‌বরো হাতুড়ে-বৈদ্যঃ বার্বরো গো-চিকিৎসকঃ।

ক্রোধে আমার শরীর জ্বলিতেছিল। আরও কতকগুলি ছাত্রবাবু বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতা-সুধাপানে আমোদময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্য আরও ক্রোধবৃদ্ধি হইল। বলিলাম,—'এখনও এত নবাবি! বাপ-দাদার আমলের যে

তালুকের গুঁড়া ছিল, তাও ত বিকাইতে বসেছে। ধারে যার মাথার চুল বিক্রয় হয়ে রয়েছে,—তার আবার এত লম্বা কথা।

ললি। বেশ বেশ! একটা তুমুখো থলে সেলাই কর গে; আমাদের তালুকখানা কিনিয়া তাহার মধ্যে রাখিবে।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—'সে আর বেশি কথা কি? কর্জ্জ করে খাও, আর লম্বা কথা কও। কর্জ্জ করে বাবুয়ানা করা ত চুরির মধ্যে।'

ছাত্রদল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ললিত ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন,—'আমি তোর নামে মানহানির নালিশ করিব। ছোট মুখে বড় কথা! তুই বুঝি কর্জ্জ দিয়াছিস্?'

আমি। আমি না দি, বাবা দিয়াছেন; তুমি কর্জ্জ না কর, তোমার বাবা করেছেন। বেশি দিনের কথা নয়,—এই চারি বৎসর! তোমার দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তুমি ত এখানে জমিদার; দেশে তুবেলা হাঁড়ি চড়ে ত?

ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায় ললিত একরূপ জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। পাগলের মত কত কি বকিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরগণ কেহ মুখভঙ্গী করিয়া, নয়ন বাঁকাইয়া,—কেহ হাসিয়া বা উপহাস করিয়া,—কেহ বা কিছু না বলিয়া নীরবে সরিয়া গেলেন। আমিও আর দাঁড়াইলাম না।

কিয়দ্দূর আসিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম;—ললিতকিশোর সেই স্থানে, সেই ভাবে, দাঁড়াইয়া আছেন।

বাটীতে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম—অতি অপকর্ম্ম করিয়াছি। বড় মনঃকষ্ট হইল। তুই চারি দিন সেই কষ্ট বাড়িতে লাগিল। শেষে ললিতের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু ললিত বড়ই রাগিয়াছিলেন। দেখা হইলে, হয় কথা কহেন না,—না হয়

কটূক্তি করেন। কতবার তাঁহাকে কত কথা বলিয়াছি,—অনুনয় বিনয়ও করিয়াছি; কিন্তু প্রতিবারই নানাপ্রকার গালি শুনিয়া ফিরিয়াছি। ললিত শেষে এক দিন এমন অভদ্রের মত কুকথা বলিলেন, যে আর তাঁহার সহিত কথা কহিতে, তাঁহার মুখ দেখিতে প্রবৃত্তি নাই।

অমরের ভাগ্যে ললিতের উপহাস চিরকালই আছে। আমি অনেক বলিয়া, উপহাস করিয়া, ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে স্বীকার করাইয়াছি,—আর তিনি ললিতের খোষামোদ করিয়া বেড়াইবেন না। গত পাঁচ ছয় মাস অমরের মুখে ললিতের নাম বড় শুনি নাই; নিজেও তাঁহাকে অনেক দিন দেখি নাই।

মামী-মা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রস্তাবে দিলজানের সহিত আমার বিবাহের কথা উঠিল। আমরা উভয়েই বড় লজ্জিত হইলাম। উভয়েই অন্যের দ্বারা অসম্মতি জানাইলাম। কিন্তু মামা বা মামী কেহই সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন দিলজানকে বলিলাম,—'আমি কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যাই; তাহা হইলে আমাদের এই অসঙ্গত বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে।'

দিলজান উত্তর করিলেন না।

আমি বলিলাম,—'অমরও এ বিবাহের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন,—এরূপ ঘরাঘরি বিবাহ ভাল নয়।'

দিল। তিনি কি তোমাকে পলাইতে বলেন?

আমি। পলাইয়া যাওয়া তাঁহার মত নয়। তিনি বলেন,—তাহা হইলে মামা ও মামী বড়ই মনঃ-কষ্ট পাবেন।

দিল। আরও কলিকাতা ছাড়িয়া গেলে তোমার পড়া বন্ধ হবে। অমরেশ্বরকে বাবা ও মা দুজনেই ভাল জানেন। তিনি বরং

আসিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলুন। তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে নাই।

আমি। তাঁহারা একরূপ বুঝিতেছেন ; আমরা আর একরূপ বুঝি। যদি অমরের কথা না থাকে।

দিলজান বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে অনেক কথার আন্দোলন করিলাম। শেষে বলিলাম,—'আমার ত মনে হয় না যে অমরেশ্বরের কথা থাকিবে। মামা বড় বড় লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একরূপ স্থির করিয়াছেন।'

দিল। বড় লোকে কি সকল কথাই ভাল বুঝেন ?

আমি। তাঁহারা ত সেইরূপই মনে করেন। লোকেরও তাহাই বিশ্বাস।

দিল। তবে আর তুমি আমি কি করিব ?

আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। দিলজানের সহিত সম্পর্ক ফিরিল। মামা মামীর সঙ্গেও আর একটা নূতন সম্পর্ক হইল। এখন আমিই তাঁহাদের সব,—জামাতা,ভাগিনেয়, পুত্রস্থানীয় এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের বিভব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

প্রথমে মামা ও মামীর উপর বিরক্ত হইয়াছিলাম। এখন সে ভাব গিয়াছে। এখন তাঁহাদিগকে যথার্থই পিতা মাতার ন্যায় দেখি।

আমার বিবাহের পূর্ব্বে ললিতকিশোর আমার স্বভাবে দোষ দিয়া মামাকে পত্র লেখেন। বিবাহের পর এক দিন ঘটনাক্রমে মামার ঘরে ঐ পত্র দেখিতে পাই। ললিতকিশোর পত্রে এরূপ কুৎসিত কথা লিখিয়াছিলেন যে তাহা মনে করিলে এখনও লজ্জা ও ঘৃণা হয়।

মামার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের ন্যূন নয়। আমাদের ধর্ম্মে

তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। রীতিমত দৈনিক নমাজ ও জুম্মা নমাজ করিতেন; রোজা রাখিতেন; দান করিতেন; টাকা কর্জ্জ দিয়া স্থদ লইতেন না; এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ভোজন-পান স্পর্শও করিতেন না। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস—ডাক্তারি ঔষধ, বিশেষতঃ আরক, মদ নহিলে হয় না। ঐ জাতির মধ্যে এমন পণ্ডিতও আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস—ডাক্তারেরা কুইনাইনের সহিত মদের গুঁড়া মিশাইয়া দেন। মামা ধর্ম্মভীরু মুসলমান, মদ স্পর্শও করিতেন না,—লোকে ইহা জানিত। সেই জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারে ব্রাহ্মণকায়স্থ-ডাক্তারের ঔষধের পরিবর্ত্তে মামার ঔষধ ব্যবহৃত হইত।

পিতা ও মামা উভয়ে একত্র মক্কা সরিফ যাইবেন—পরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংকল্প-সিদ্ধির পূর্ব্বেই বাবার মৃত্যু হইল। সেই অবধি শরীরের অনিত্যতা ভাবিয়া মামার হজ করিবার বাসনা বড় প্রবল হয়। এত দিন দিলজানের বিবাহের অনুরোধ বাধা ছিল। এখন আর কোন বাধাই নাই। তিনি মক্কা-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। মামী সঙ্গিনী। পিতা মাতার উদ্যোগ দেখিয়া দিলজানও নিজের বস্ত্র গুছাইতে বসিলেন। আমিই বা কেন ঘরে বসিয়া থাকিব?—আমার সখও আছে; ধর্ম্মবুদ্ধিও আছে; দেশভ্রমণে বিদ্যা বাড়ে—ইহাও জানি। অর্থের চিন্তাও নাই। আমারই বা কেন হজ করা হবে না? আমি সঙ্গে লইবার বইগুলি বাঁধিতে উদ্যোগী হইলাম। পড়া শুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া মামা আমাকে অনেক বুঝাইলেন,—কথা কহিলাম না। মামীও বুঝাইলেন,—বুঝিলাম না। কালেজে গিয়া ছুটির প্রার্থনা করিলাম; মিলিল না। মনঃপীড়া পাইলাম; মামার

উপর রাগ হইল ;—তাঁহার অনুরোধেই হয়ত আমার ছুটির আদেশ হইল না। একদিন ভাত খাইলাম না ;—মামী আমার কাছে বসিয়া বুঝাইতেছেন ;—আমাদের একজন পুরাতন বাঁদী বলিল,—'দিল-জান যাইতেছে বলিয়াই তোমার জামাই হজ করিবার জন্য এত ব্যস্ত।' তাহার পর আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল,—'মক্কায় গিয়ে হবে কি?—যাবে মক্কা, খাবে ধাক্কা, নামটি হবে হাজি। ঘরে ফিরে আস্‌বে তুমি, যে পাজি সে পাজি।' মামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—'দিলজানকে বাড়ীতে রেখে যাও দেখি, আর তোমার জামাই হজে যেতে চাবে না।'

মামীর সম্মুখে বড়ই লজ্জা পাইলাম। মনে মনে বাঁদীর শত মুণ্ডপাত করিয়া বাহিরে গেলাম।—এবার মামা বলিবামাত্র বাড়ীতে থাকিতে স্বীকার করিলাম। মামা আমাকে সুশীল ও সুবোধ বালক জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে চলিয়া গেলেন। আমি সংসারে কর্ত্তা হইয়া রহিলাম।

৪

গ্রীষ্মাবকাশ আসিয়া উপস্থিত। অমর দেশে চলিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আর আমি দেশে যাই নাই। এখন কলি-কাতার বাটীতেও আমি একাকী। আগ্রহের সহিত অমরের সঙ্গী হইলাম।

আমাদের জেলায় সহরে আসিয়া অমর কতকগুলি আম ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী কিনিয়া লইলেন। আমি তাঁহার এই নিয়ম-ব্যতিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

আমাদের বাটীতে স্বপরিজন বা আত্মীয় কেহই নাই। ভাবিলাম,—অমর বুঝিয়াছেন—আমি একবারে তাঁহাদের বাটীতে যাইব; সেই জন্যই এত খাদ্য সামগ্রী। যিনি এই নয় বৎসর সন্ন্যাসীর মত সর্ব্ব-বঞ্চিত হইয়া কাটাইয়াছেন, আমার জন্য তাঁহার এই ব্যয়!

একে আমি ভোজনপ্রিয়, তাহাতে আবার নিজ বাটীতে অমরের ন্যায় প্রিয় আমার কেহই নাই। সুতরাং অমরের বাটীতেই আগে যাইব—স্থির করিয়া চলিলাম। কিন্তু গ্রামে আসিয়া একটু দুষ্টবুদ্ধি জুটিল। অমরেশ্বরের কথা রাখিলাম না;—নিজের বাটীর দিকে চলিলাম।

অমর চলিয়া গেলেন। আমি বাড়ীর দিকে কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিলাম এবং অমরের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অনেক পশ্চাতে মৃদুপদে চলিলাম।

অমরেশ্বর বাটীর নিকটে আসিয়া একটা বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘাটে গিয়া আপনার পুরাতন বস্ত্র ও চটিজুতা ছাড়িয়া নূতন বস্ত্র, জামা, চাদর ও জুতা পরিলেন; এবং নূতন ছাতা মাথায় দিয়া—বাবু সাজিয়া বাটীর দিকে চলিলেন। এমন বাবু-সাজ ত অমরের কখন দেখি নাই;—এমন কাপড় জামা, এমন পরিচ্ছদ অমরের অঙ্গে কখন দেখি নাই। ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। অমর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি বাহিরে, বেড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিতে লাগিলাম।

অমর ডাকিলেন, 'মা।'

মা ঘরের ভিতর ছিলেন; ব্যস্ত হইয়া একবারে উঠানে আসিলেন। অমর প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'দেখ, মা, কেমন সাজি;

আকবর।

কিনিয়াছি; আমার এই জামাটি কেমন দেখাচ্ছে,—বল দেখি? বেশ রঙ,—না মা?'

মা অমরের চিবুক ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মাতা-পুত্রে কথা চলিল; আমি সেই বাহিরে দাঁড়াইয়া। অমর তিনখানি থালা আনিয়া গৃহের বারান্দায় বসিলেন। মার জন্য আনীত কাপড়গুলি বাহির করিলেন; একখানি হাতে লইয়া বলিলেন,— 'মা, এই কাপড় খানি পর না।'

মা। কেন বাবা, এইরূপে টাকা খরচ কর।

অম। এই কাপড়খানি পর না মা,—নহিলে আমি আর কাপড় জুতা পরিব না। ছাতাও মাথায় দিব না; বৃষ্টিতে ভিজে খালি-পায়ে কালেজে যাব।

মা। পরমেশ্বর তোমার উপর মুখ তুলিয়া দেখুন। ভাল কাপড় পরিবার দিন আসুক,—অবশ্য পরিব।

অম। এখন এক খানি কাপড় পর,—নহিলে ছাড়িব না।

মা। গেল বারে তুমি যে কাপড় এনে ছিলে, তাহা এখনও অনেক দিন চলিবে। শিবুদাসের স্ত্রী, আর তিনটা বিধবা মেয়ে,— এক খানা কাপড় নাই;—লজ্জা রক্ষা হয় না। ওরা তোমাকে কত কোলে করে মানুষ করেছে। তুমি জল খেয়ে এই কাপড় চারি খানি নিজে লয়ে গিয়ে উহাদের দিয়ে এস। কত আশীর্ব্বাদ করিবে।

অমর আর কথা কহিলেন না। আম্র ও অন্যান্য খাবারগুলি বাহির করিয়া তিন খানি থালে সাজাইতে লাগিলেন। বলিলেন,— 'আকবর বেশে আসিয়াছেন; আমার সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ী গিয়াছেন।

মা। আকবরের সঙ্গে কি রাগারাগি করিতে আছে ?

অম। এখানে আসিবার জন্য কত বলিলাম; শুনিলেন না; তাই আমার রাগ হল।

মা। জল খেয়ে তাকে ডেকে আন। তার সঙ্গে কি বিবাদ সাজে বাবা !

অম। বিবাদ নয়; তিনি কখনই বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন না; এখনই আসিবেন। তাঁর জন্যও খাবার সাজাইয়া রাখি।

'মা তুমি খাও না'—বলিয়া অমর নিজে ভোজন আরম্ভ করিলেন। আমি আর বাহিরে দাঁড়াইলাম না। ভিতরে যাইবামাত্র মা আমাকে সাদরে ডাকিলেন; বসিবার আসন দিলেন। অমর আমার দিকে চাহিয়াও চাহিলেন না। আমার একটু হাসি আসিল।

অমর বলিলেন,—'মা, তুমি খাও।'

'আকবরকে দি'—বলিয়া মা একখানি থালা আমার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। আমার প্রতিশোধ লইবার সময় উপস্থিত। বলিলাম,—'আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না।'

মা। তুমি কি ইহার মধ্যে বাড়ী গিয়ে জল খেয়ে এসেছ ?—তা হলেও বাপু,—ওগুলি তোমায় খেতে হ'বে।

অমর মার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'কখনই এখনও বাড়ীতে যান নাই। সমস্ত দিন কিছুই খান নাই। সকালে যখন জেলা থেকে আসি, তখন আমি খাইলাম না বলিয়া নিজেও কিছু খেলেন না। ক্ষুধা নাই,—সব মিথ্যা কথা।'

মা। ওরূপ কথা বলিতে নাই; ভাল করে বলিতে হয়। আকবর, খাও ত বাবা।

আমার এই সুযোগ। বলিলাম,—'উনি বলুন দেখি, গত আট নয় বৎসরের মধ্যে আমার কোন জিনিষ খেয়েছেন কি না? কখনও কোন ভাল সামগ্রী দিলে,—খাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিলে, এমন মুখ বিমর্ষ করেন, চোখ ছল ছল করে,—আমি আর কিছু বলিতে পারি না। আমার বিবাহের পর কালেজের ছেলেদের ভোজ দিলাম—উনিই উদ্যোগী; কিন্তু বলুন দেখি,—একটা সামগ্রী মুখে দিয়েছেন? উনি আমার খাবেন না, আমি খাব কেন?—আমি চলিলাম।'

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অমরও অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'খাইবে না?'—অমনি চক্ষুর প্রান্তে জল দেখা দিল। আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, —'আমি তোমাকে বেশ চিনিয়াছি।'

হিন্দু-সমাজ-প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করিয়া অমর আবার ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এ কাজে আমার দক্ষতা অধিক। চক্ষু পালটিতে বিলম্ব সহে না,—এক একটি দ্রব্য উঠিয়া যায়। মা তৃতীয় পাত্রস্থিত কয়েকটি আম আমার থালে দিলেন; অমরকেও দিতে গেলেন; অমনি অমর হাত তুলিয়া বলিলেন,—'মা, তুমি খেলে না; তবে আমিও আর খাইব না। আজ উপবাস করিয়া থাকিব।'

মা। তোমরা তুজনে খেলেই আমার উদর পূর্ণ হল,—আমার তৃপ্তি হল।

এতক্ষণে আমারও চৈতন্ত হইল। তুজনে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলাম। মা খেবে তাঁহার সেই স্থির গভীর স্বরে বলিলেন,— 'বাবা, শ গাছ ছিল। এখন অমরের আম খাইবার

জন্ত একটা গাছ নাই। যদি কখনও আমার গাছ আমার হয়,—তখন খাইব ; নতুবা নয়।'

আমি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া কত কথা জানিয়া লইলাম। শেষে বলিলাম,—'মা, আমরা তোমার দুই সন্তান আছি, তবু তোমার ইচ্ছা পূরিবে না? তুমি আশীর্ব্বাদ কর ;—আমরা কৃতকার্য্য হইব।'

মা। অবশ্যই হইবে। ঈশ্বর আছেন ; তিনি দেখিতেছেন। আমার ত পাপের সংসার নয়। আমার জীবনে কুলায় কি না—জানি না ; তবে ইহা আমার মনে আছে,—অমরেশ্বর মহাপুরুষের সন্তান,—বংশের মান বজায় করিবে।

অমর মাসে মাসে মার নিকট টাকা পাঠাইয়া দিতেন। মা তাহার একটি পয়সা ব্যয় না করিয়া সমস্ত এক মহাজনের আড়তে গচ্ছিত রাখিতেন। বৎসরের শেষে সুদের অধিকাংশ টাকাও আসলে গণ্য হইয়া খাতায় জমা হইত। এইরূপে কয় বৎসরে প্রায় দেড় হাজার টাকা অমরেশ্বরের নামে জমা হইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর মহাভারত খাজানা বন্ধ করিয়াছিলেন। এখন আবার নাকি তাঁহার সুর ফিরিয়াছে ; এখন নাকি বলেন,—বন্ধুর—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ছেলের ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার জন্ত এতদিন সাহায্য করিয়া [illegible]। ছেলে এখন খুঁটে খেতে শিখিল বলিয়া তিনিও সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন। পরের ভার চিরকাল বহে কে?

আমরা মহাভারতের নিকট গিয়া খাজানার কথা উত্থাপন করিলাম। তিনি সে কথার উত্তর না দিলেও অনেক কথা বলিলেন। গৌরহরি পোদ্দারের দোকানে শতকরা এক টাকা সুদে

অমরের টাকা জমা হইতেছে। তিনি ১॥০ টাকা সুদে ঐ টাকা জমা রাখিতে প্রস্তুত ; অথচ অমরের জননী সে কথায় কাণ যেন না দেন। গৌরহরি তেমন বিশ্বাসপাত্রও নহে ; তাহার এমন বিষয়ও নাই যাহাতে দেড় হাজার, দুহাজার টাকা সহজে আদায় হতে পারে। টাকাটা তাঁহার কারবারে খাটিলে আরও বেশি লাভ হয়।

আমি বলিলাম,—'সে যাহা হয় হইবে ; এখন খাজানার কথাটা হউক।'

সেই ত মূল কথা। খাজানার কথা ত আছেই। আর খাজানা আইন মত দেনা হইলে, না দিয়া অব্যাহতি নাই। ইংরাজের বড় কঠিন আইন,—বড় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,—ভারি শাসন। সমস্ত দেশ নখ-দর্পণ করিয়া রাখিয়াছে। রামরাজ্যেও এমন ছিল না। এখন ছোট বড় প্রভেদ নাই ; মুড়ি মিছরির এক দর ; বাঘে গরুতে একত্র জল খায় ; আর চুল চিরে সূক্ষ্ম বিচার,—যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। এখন আর মেকি চল্‌বে না বাপু ; কেবল কথা বেচে জিতে যাবে,—ফাঁকা আওয়াজে লড়াই মার্‌বে,—সে দিন আর রহিল না। অমরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'তোমার মাকে [illegible] লইয়া যাও। উনি এখানে বড় কষ্টে থাকেন,—তুমিই একমাত্র সন্তান ;—আর ত কেহই নাই। কলিকাতার দেশে উনিও ভাল থাকিবেন,—তোমারও কষ্ট হবে না। তোমাদের বাড়ী-রক্ষার ভার আমি লইলাম। আর যদি এখন কলিকাতায় সে সুবিধা না করিতে পার—তাহা হইলে উনি বরং আমার বাড়ীতে থাকুন। একা ঐ বাটীতে থাকা ভাল দেখায় না। উনি ত তেমন প্রবীণ হন নাই ;—গৌরহরি আবার বড় অসৎ লোক।

অমরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কম্পক-গৌর মুখ আতাম্র হইয়া উঠিল ; বলিলেন,—'সে কথায় তোমার কাজ কি?'

মহাভারত চোখ রাঙাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—'বাপ্‌রে, ছুটো একটা পাশেই এই ;—না জানি এপাশ ওপাশ কি হবে।'

আমি যে ভয় করিয়াছিলাম, অমর সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাহাই ঘটাইলেন। এখন মহাভারতের চক্ষু-লজ্জা গেল ; এখন অবধি প্রকাশ্য ভাবে অনিষ্ট সাধিবেন। অমরের অন্নাশন টুকু পাইলে তাঁহার সুবিধা হয়। এ গ্রামে অমরের বাস উঠিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। তাঁহার ব্যবহারে লোকে তাঁহাকে বড় নিন্দা করে ; কারণ, অমর প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশে জন্মিয়া তাঁহার কৌশলেই এখন দীন হীন। আবার লেখা পড়া শিখিয়া অমর যদি নিজের অবস্থা ফিরাইতে পারেন—তাহা হইলে গ্রামে তাঁহার একাধিপত্য ঘুচিয়া যাইবে,—সে ভয়ও বোধ হয় ছিল।

এ অবস্থায় এখন আর মিষ্ট কথা ও তোষামোদে কাজ হবে না বুঝিয়া বলিলাম,—'দেখি, কলিকাতায় ত যাই। মামার সঙ্গে বড় বড় উকিলের আত্মীয়তা। তাঁহারা কিরূপ পরামর্শ দেন,—মামাই বা কি বলেন,—দেখা যাউক।'

মহা। ওহে বাপু,—পরামর্শদাতা অনেক আছেন, অর্থ-দাতা কেহই নাই। আদালতের টিকটিকি পর্য্যন্ত পয়সায় মুখ হাঁ করিয়া থাকে। ঐ ত হাজার খানেক, না হয় দেড় হাজার টাকা। আর ত নয়। তোমাদের যেরূপ মেজাজ—টাকা কটা খোওয়াইয়া ঐ বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়েকে না ভাসাইয়া ছাড়িবে না। বাবা মহাশয়,—ঐ ছোট ঠাকুরটির বাপ,—পুণ্যবান লোক,

—স্বর্গে গিয়েছেন ;—মরিবার সময় আমাকে অনেক বলে গিয়েছিলেন। তাই আমার এত আকিঞ্চন। একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে সেই পিতার সন্তান,—তেজীয়ান্ ত হবেই। ছোট সাপটিও ত সাপ। তাহারই আবার বিষ অধিক।

আমি। আহা কি রাক্ষসী মায়া গো।

মহাভারত মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—'বাঃ রে; এও যে এক অবতার দেখিতেছি। বাপু হে, আমি এই বয়সে অনেক দেখিলাম। আজি তুমি নাকি সহরে কোন্ ডাক্তারের মেয়ে সাদি, না নিকা করে—তাজ মাথায় দিয়েছ,—চাপ্‌কান পরেছ—বুট জুতা পায়, ঘড়ির চেন গলায়।—আর তোমার পিতামহ তাজু মণ্ডল—আজ ত তুমি তালুকদার হয়েছ—সরকার হয়েছ—কবে মুন্সী মোল্লা সৈয়দ হয়ে বস্‌বে,—তোমার সেই পিতামহ—সেই বুড়া—নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে চাষ করেছে। আর দাদামহাশয়েরও গুণাবল বলিতে হবে,—যবন হয়েছে তাঁহার ছেলের সহচর।

অম। শত বৎসর ঐ যবনের পদসেবা করিলেও তুমি উহার—

মহা। তোমরা জন্ম জন্ম ঐ যবন-সেবা কর; চরণামৃত খাও। ব্রাহ্মণের সন্তান—খাবে না ত কি? যবন আবার ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বায়, খায়, শোয়। এখন কীর্ত্তির ধ্বজা না উঠিলে হয়। 'দাদা মহাশয়',—মহাভারত ঊর্দ্ধমুখে, চক্ষু উল্টাইয়া কহিলেন,—'দাদা মহাশয়, তুমি মহাপুরুষ ছিলে; তোমার জন্য, তোমার নামের জন্যই আমার আজ এত লাঞ্ছনা।'

মহাভারত বোধ হয় কলিকাতার থিয়েটার দেখিয়া একটু

করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া আমার হাস্যস্রোতে একটু আঘাত লাগিল। ঘৃণা ও কৌতূহল মিশিয়া আমার প্রকৃত রাগের উপর যেন ক্ষীণ মেঘের আবরণ দিল।

এই সময়ে মহাভারত-তনয় রামায়ণ রঙ্গভূমিতে দেখা দিলেন। অমর যখন রামায়ণকে পড়াইতেন, তখনই তিনি গলায় মালা দিয়া, নামের ঝুলি হাতে ঝুলাইয়া ছিলেন। এই কয় বৎসরে বেশ পক্কতা জন্মিয়াছে। এখন সর্ব্বাঙ্গে নামের ছাপ; গায়ে নামাবলি; পরিধান চেলির যোড়; গলে মোটাদানা কাঠের মালা; পায়ে খড়ম; ঝুলি হাতে থেকে বুকে উঠিয়াছে। রামায়ণ আসিয়া—'প্রণাম পণ্ডিতমহাশয়' বলিয়া, জানু পাতিয়া, মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিলেন। আবক্রদেহে গ্রীবা বাঁকাইয়া উত্তান কর মাটিতে পাতিয়া বিস্তৃতাধরোষ্ঠে বলিলেন,—'একটু চরণ-রেণু।'

ক্রোধের উগ্রতা ও কৌতুকের প্রসন্নতা মিলিয়া অমরের মুখে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম দেখাইল। তথাপি প্রিয় শিষ্যের মনস্কামনা পূরণার্থ তিনি কৃতোদ্যম হইলেন না। অগত্যা রামায়ণ নিজেই গুরুর পাদস্পর্শ করিলেন এবং রেণুর অভাবে পাদস্পৃষ্ট বায়ু লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন,—রসনাগ্রে লইয়া স্বাদ গ্রহণ করিলেন। বলিলেন,—'আঃ জীবন সার্থক হল; তাপিত প্রাণ শীতল হল; আজি কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হয়েছে।'

অমরের মুখের মেঘটুকু ক্রমেই সরিয়া যাইতে লাগিল। আমার একটু আমোদ জন্মিল। রামায়ণ বলিলেন,—'তালুক-দারজি, মেজাজ সরিফ হ্যায়?'

আমি ভাবিতেছি,—রামায়ণ কথাটা কোথায় শিখিলেন।

তিনি কহিলেন,—'শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় মুসলমান হরিদাস বাবাজিও — গোস্বামী হইয়াছিলেন। আমার পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া আপনারও দেহশুদ্ধি হইয়াছে। এখন আমিও আপনাকে নমস্কার করিতে পারি।'

আমি চরিতার্থ হইলাম! পরম ধার্ম্মিক বলিয়া রামায়ণকে প্রশংসাপত্র দিলাম। তিনি বলিলেন,—'গৌর বল, হরি বল, তাঁহারই ইচ্ছা। বাবা, পণ্ডিতমহাশয়ের খাজানার টাকাগুলি পরিষ্কার করিয়া দিন্।'—অমরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'দয়াময়, এ দীন হীনের উপর যেন দয়া থাকে। আমার ভরসা—কেবল ঐ চরণদুটি।'

মহাভারত বলিলেন,—'খাজানা ত দিতেই হবে;—হিসাবটা করা চাই।'

রামা। হিসাব আমার কাছে আছে। সমস্ত ঠিক করে রেখেছি। ব্রাহ্মণের ঋণ,— বিশেষ উনি আমার গুরু।

একে দীর্ঘচ্ছন্দে প্রণাম, তাহার উপর টাকার কথা;—ব্রাহ্মণের রাগ আর কতক্ষণ থাকে? অমর বলিলেন,—'তবে রামায়ণ, হিসাবটা আন।'

'অনুমতি হলেই আনি'—বলিয়া রামায়ণ উঠিয়া গেলেন; কতকগুলি হিসাবের কাগজ আনিলেন। হিন্দুরা ছেলেদের কর্ণবেধ করেন। কাণফোঁড়াটা তাঁহারা এতই ভাল বুঝেন যে, হিসাবের কাগজগুলিরও কর্ণবেধ করিয়া শুদ্ধ করিয়া লয়েন।

আমি মার লেখা হিসাবটি বাহির করিলাম। রামায়ণ কাগজ খুলিতে খুলিতে বলিলেন,—'পণ্ডিতমহাশয়ের অনেকটা টাকা পাওনা হয়েছে; কিছু টাকা আগে [illegible] পাঠায়ে দিলে

হাল্কা হয়ে থাকিত। আর পণ্ডিতমহাশয়, আপনিও আমা-দিগকে ভুলিতে বসেছেন। একখানা পত্র লিখিলেই ত টাকা পাঠায়ে দিতাম। তবে, খরচ ত চলে গেছে;—এখন একবারে বেশি টাকা পেলে অনেক কাজে লাগিবে। একখানা ভাল ঘর বাঁধুন। আমি নিজে থেকে দেখা শুনা করিব। আর বাঁশ যাহা লাগে,—নিজের ঝাড় থেকে দিব। উলু খড়ও কিছু দিতে পারিব।'

রামায়ণের কথায় বড়ই প্রীত হইলাম; একটু লজ্জাও পাই-লাম। বলিলাম,—'তা হলে ত ভালই হয়; বাঁশ খড়ের দাম ত সমানই পড়িবে; লাভের মধ্যে বহনি-খরচ কম লাগিবে।'

রামায়ণ দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন,—'রাধে কৃষ্ণ! পণ্ডিতমহাশয়ের ঘর বাঁধা হবে—আমরা বাঁশ খড়ের দাম লইব? তা হলে সকলই বৃথা; আমাদের এ বাঁশ খড়ই বা কেন?'

মহাভারত বলিলেন,—'তালুকদার, অমরেশ্বরবাবু কি আমার পর। রামায়ণ যদি একখানি ঘর বাঁধে, তা হলে আমি বাঁশের দাম চাহিব? উহাঁর পিতার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তুমি তাহা জান না। তিনি আমার বড় সহোদরের ন্যায় ছিলেন; প্রতি-পালন করেছেন,—বিপদে রক্ষা করেছেন;—এক কথায়—আমার সর্ব্বাচ্ছাদক ছিলেন। তাঁহার সন্তান এইটি,—আমার কত যত্ন, কত আদরের সমগ্রী—মুখে বলে কি জানাব। যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন।'

অমর বলিলেন,—'কাকা, ক্রোধের বশে অকারণে, না বুঝিয়া তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। অন্যায় করিয়াছি,—'

মহা। তুমি আমার রামায়ণ অপেক্ষাও বড়। ছেলেরা কত সময়ে কত কথা বলে। দাদামহাশয়কেও তুমি কত গালি

দিয়াছ,—মারিয়াছ,—চুল ছিঁড়িয়াছ;—তাই কি তিনি অপরাধ লইতেন?

আক। রামারণ বাবু, তবে হিসাবটা বাহির করুন।

রামা। আপনি উপহাস করিতেছেন। আপনার কি আমাকে 'বাবু' বলা সাজে? আমি সামান্ত ব্যক্তি;—বিদ্যা নাই; বুদ্ধি নাই; পাশ করি নাই; ধন সম্পদ নাই; লোকবল নাই। আপনি মহৎ ব্যক্তি; আমি কি আপনার উপহাসের পাত্র? হিসাবের কথা,—এই ত এনেছি। আর এ হিসাবেই বা প্রয়োজন কি? ঠাকুর-জেঠাই নিজেই হিসাব রাখেন। যাহা পাওনা লেখা আছে—তাহাই ঠিক; আমরা কি আর তাহা অস্বীকার করিব?

আমি দেখিয়া বলিলাম,—'গত চৈত্র পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া চারি শত আঠার টাকা পাওনা হইয়াছে।'

রামা। একবারে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের খাজানাও হিসাবে তুলিয়া টাকা লইয়া যান। আমার হিসাবেও এই দু মাসের টাকাটা তুলিয়া লই।

রামারণ হিসাব বাহির করিলেন। অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন; শেষে বলিলেন,—'তালুকদার সাহেব, আপনার বোধ হয় দেখিবার ভুল হইয়াছে। গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এই হিসাব করা রহিয়াছে। সাবেক ওয়াশীল বাদে মোট পাওনা—এক শত সাত টাকা বার আনা। আমরা সাত টাকাই দিয়াছিলাম। তবে বাবা বাকি পণ্ডিতমহাশয়কে রাসে, দোলে ও চড়কে চারি আনা করিয়া পার্ব্বণি দেন, তাই বার আনা যোগ হয়েছে। আর যদি আগামী বৎসর পার্ব্বণিও কাটান চাহেন, তাহা হইলে এক শত সাত টাকাই আদায় করুন। পূজার পার্ব্বণি কাপড় চাহেন

দাম—ধরে হিসাব হয়েছে। এই দেখুন—১৪ই আশ্বিন কাপড় চাদরের দাম—তিন টাকা। বৎসর বৎসর এই রকম আছে। বলেন ত দেখাইয়া দি। পণ্ডিতমহাশয় হয়ত এ পার্ব্বণির কথা জানেন না; কিন্তু বরাবর খাজানার সঙ্গে দেওয়া হইতেছে।'

অমর আমার হস্তস্থিত হিসাব লইয়া দেখিলেন। অনেক ক্ষণ ধরিয়া এ পাত, ও পাত সমস্ত পড়িলেন। আমার দিকে, রামায়ণের ও মহাভারতের দিকে চাহিলেন;—মুখে কথা নাই।

রামা। ও হিসাবে কি সত্য সত্যই বেশি পাওনা লেখা আছে? তাহা হইলে পণ্ডিতমহাশয় একবার বাড়ীতে গিয়া ঠাকুর-জেঠাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন। কবে কি টাকা দেওয়া হয়েছে, তাহার ফর্দ্দ করিয়া দিতেছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ভুল ধরা পড়িবে। হাজার হউক—স্ত্রীলোক ত; টাকার হিসাব রাখা কি তাঁহার কাজ! তথাপি তিনি যাহা করেন, তাহা আর কেহই পারে না।

মহা। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

আক। বাবার মৃত্যুর পর ত আপনি এক পয়সাও খাজানা দেন নাই; সে কথা আপনি মামার পত্রেও স্বীকার করিয়াছেন।

মহাভারত একটু হাসিয়া বলিলেন,—'এখনই কি অস্বীকার করি? তোমার পিতার মৃত্যুর পর আর কিছু দেওয়া হয় নাই। বৌঠাকুরাণীর টাকার প্রয়োজনও এদিকে ছিল না; আর স্ত্রীলোকের হাতে টাকা দিলেই এইরূপ গোলমাল;—দেখিতেছ ত?'

আমি। তাহা হইলেও এই প্রায় চারি সনের টাকা পাওনা।

মহাভারত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'যাহারা ভিতরের কথা জানে না, তাহারা ত সেই রকমই মনে করিবে। তবে আসল কথা ত বাপু, তোমারও অজানা নাই। বৌঠাকুরাণীর সংসারে

বড় কষ্ট ছিল,—চলিত না। সেই জন্ত বরাবরই আগাম টাকা দিয়ে এসেছি। টাকা চাহিলেই দিয়াছি,—নহিলে চলিবে কিসে? আমার সঙ্গে ত কেবল প্রজা-মনিব সম্বন্ধ নয়। রামায়ণ এখন নিজে হিসাব রাখেন। পশ্চিমে সূর্য্য উঠিলেও একটি পয়সা এদিক ওদিক হবার যো নাই। হিসাব ঠিক আছে।’

আমরা দুজনে পরামর্শ করিলাম। মহাভারতের সঙ্গে মোকদ্দমায় ফল পাওয়া যাবে না। তবে আর বিবাদে ফল কি? যাহা দেয়,—লইয়া যাই।

রামায়ণ বলিলেন,—‘পণ্ডিত মহাশয়, আপনার কি আমার উপর অবিশ্বাস হয়?—আমি বলিতেছি, এ হিসাবে কোন গোল নাই। টাকাগুলি লইয়া যান,—আমাদেরও ব্রহ্মঋণ শোধ হইক।’

মহা। ঋণ মহাপাপ। দেখ বাপু, কখনও যেন ঋণ করিও না। দাদা মহাশয়—অমন ধার্ম্মিক, অমন সাধু লোক,—কিন্তু দেখ মরিতে না মরিতে ঋণের দায়ে সর্ব্বস্ব গেল! কেবল আমি মধ্যে পড়েছিলাম বলে ভদ্রাসনটি রহিয়া গেল;—আর এই এক শত টাকা খাজানা,—যাহাই হউক একরূপ অন্ন-সংস্থানটা আছে। আমারই পাওনা টাকাগুলি গেল। হিসাব পত্র সব আছে। লেখা পড়া শিখে তখন পিতৃ-ঋণ শোধ দিবার ইচ্ছা হয়,—দিও। আমি চাহিব না।

আমি বলিলাম,—‘তবে টাকা দিন।’

মহা। এখনই। রামায়ণ তবে টাকা আন।

রামা। আনি। পণ্ডিত মহাশয়, আপনি একখানা দাখিলা লিখুন। বরং একখানা ফারম দেখিয়া লিখুন। দাখিলার প্রয়োজন কিছুই নাই। তবে কি জানেন—ভবিষ্যতে আবার এইরূপ গোল হতে পারে; দাখিলা থাকিলে আর সে ভয় থাকে না।

অমর। বল না—কিরূপ লিখিতে হইবে, লিখিতেছি।

মহাভারত গম্ভীরভাবে বলিলেন,—'দাখিলা ত তোমার লেখা হয় না। তোমার বয়স এই সতর বৎসর এগার মাস। নাবালক কি সাবালক, তাহা ত ঠিক নাই। আমিও আইন কানুন ঠিক জানি না।'

রামা। তবে কি হয়?—উপায়?

আমার মন ভাঙ্গিয়া গেল। মহাভারতের মুখে কি বাহির হয়, —জানিবার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—'কি জান, দাখিলার কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন না লওয়া ভাল হয় না। অথচ দাখিলা দিবার লোক ত দেখি না। খাজানা বন্ধ রাখিলেও চলিবে না। অমরেশ্বর, বাবা, তুমি একটা কাজ কর। কলিকাতায় যাইতেছ; গিয়াই দুই এক জন ভাল উকীলকে জিজ্ঞাসা করিবে। তালুকদার, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে অনেক বড় উকীলের আলাপ। তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়টা স্থির কর। তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাতেই আমি স্বীকার। দাখিলা লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিও, আমি টাকার নোট করিয়া রেজিষ্টরিতে কলিকাতায় পাঠাইব।'

রামা। আর অনুমতি হইলে ঠাকুর-জেঠাইকেও দিতে পারি।

মহাভারত আগ্রহের সহিত বলিলেন,—'আর বাবা, আমার দিব্য, একটি কাজ করিও। পার্ব্বণির টাকা যাহা দিয়াছি, তাহা যেন দাখিলায় তুলিও না।'

আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমার হাসি দেখিয়া রামায়ণ মহাভারত অপ্রস্তুত হইলেন। সামান্য গোছের অন্য কোন

পুরাণও সে ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে ঐ দশা এড়াইতে পারিত না।

বিচিত্র-কেশ, বিচিত্র-বেশ ধরিয়া, আত্মগোপন করিয়া নট নানা সাজে রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয়। অভিনয়ের মধ্যে ঘটনাবশে কেশ বেশ খসিয়া আত্মপ্রকাশ হইলে যেমন তাহার জড়তা জন্মে, মন ভাঙ্গে, পিতা পুত্রের,—বিশেষতঃ নূতন ব্রতী রামায়ণের—কিয়ৎকালের জন্য সেই দশা ঘটিল। মহাভারত অভ্যস্ত চতুর নট,—একরূপ সাম্‌লাইয়া গেলেন; কিন্তু রামায়ণ সাম্‌লাইতে গিয়া ধরা দিলেন; বলিলেন, —'বাবা, পণ্ডিতমহাশয় নিজে উপস্থিত; তালুকদার-সাহেবও বড় মুখ করিয়া সঙ্গে আসিয়াছেন। মনে না করেন—আমাদের যোল কড়াই কাণা। দাখিলা যাহা হয়,—পরে হইবে; নিদান পক্ষে অর্দ্ধেক টাকা দিলেও হয়। এই যাতায়াতের খরচটাও ত হইয়া যায়।

মহা। বেশ ত। আমার অবিশ্বাস নাই। তোমার কাছে কত টাকা আছে, এনে দাও।

রামায়ণ বাহিরে গেলেন। অনেক ক্ষণের পর আসিয়া বলিলেন,—'বাবা, আমার তহবিলে মোট দুটাকা আছে। খাতাঞ্চি মহাশয় এইমাত্র সমস্ত টাকা খাজানা দাখিলের জন্য জেলায় পাঠাইয়াছেন। আপনার নিজ তহবিলের টাকা এখন দিন্। টাকা আসিলে আগে আপনার টাকা দিব।'

মহা। 'দেখি আমার কাছে কি আছে;—বিশেষ তোমার পণ্ডিত, মানরক্ষাও ত চাই।

মহাভারত উঠিলেন। উচ্চশব্দে লৌহসিন্ধুকের দুটি কুলুপ ও উপরের তালা খুলিল। পিতাপুত্রে ধরিয়া সিন্ধুকের ডালা তুলিলেন; হাতড়িয়া একটি বাক্স বাহির করিলেন; চাবি খুলিলেন; দেখিলেন,

—মুখ বক্র করিয়া কহিলেন,—'কি হইল, আমার তহবিলে কি এই দেড় টাকার বেশি নাই? তবে কি হইবে?'

আমি হাস্য সংবরণের জন্য ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিলাম। মহাভারত দেখিলেন; কিন্তু এবার কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।—বলিলেন,—'যাহা আছে, বরং তাহাই দাও; তুমি টাকা ছুটি আন।'

রামায়ণ আবার বাহিরে গেলেন। মহাভারত বাক্স সিন্দুক লইয়া ব্যস্ত হইলেন। আমি অমরকে জিজ্ঞাসিলাম,—'কি করা যায়।'

অমর সহাস্যমুখে বলিলেন,—'শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং, ধনঞ্চ ক্ষয়মাগতম্।'

আমি বলিলাম—'আর অন্নঞ্চ উদরাগতম্।'

গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আর চারি দিন পরে আমরা কলিকাতায় যাইব। অমরের জননী অদ্য আমাদের জন্য নানাপ্রকার ভোজনের উদ্যোগ করিয়াছেন। আমরা নিজেও উদ্যোগী। নিজে সমস্ত না করিলে ভোজনের তৃপ্তি হয় না। সেই জন্যই ত চড়িভাতের প্রথা।

ভোক্তব্য-দ্রব্যের ফর্দ্দ মার নিকট দাখিল করিয়া দিয়াছি। আমাদের নির্দ্দেশ মত পাক হইতেছে; বড়ই মনোরম গন্ধ বাহির হইয়াছে। অর্দ্ধস্ফুট নলিন গোলাপ বল,—সুপক্ব কদলী রসাল বল,—সদ্যোজাত, মধুমূর্ত্তি নলেন গুড় বল,—আতর গোলাব বল, মৃগনাভি বল,—ব্যঞ্জনের হিঙ্গুসন্তলন-গন্ধের নিকট কাহারই দাঁড়াইবার স্থল নাই। নাসাপথ সেই মোহন গন্ধে পূর্ণ; মস্তিষ্ক সেই মধুগন্ধে মত্ত; শরীর স্নিগ্ধ; মন পুলকিত; জঠরানল প্রদীপ্ত; রসনা লালায়িত। ব্যঞ্জন অপেক্ষা আবার ব্যঞ্জনপাকের সন্তলন-গন্ধ অধিক মনোরম। আমার মনে হয়,—অগ্নিমান্দ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্ত-

তাহাদিগকে পাকগৃহের বারান্দায় বসাইয়া রাখিলে ক্রমে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া তাহাদের রোগ সারিতে পারে।

চিরকালই পাকশালা আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়স্থান। রসজ্ঞ অনেক লোকের মতে রসনা-তর্পণেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমারই বা অপরাধ কি? জগতে সকলেই সুখান্বেষী, তৃপ্তির ভিখারি। যাঁহারা বলেন,—মনের তৃপ্তিতেই প্রকৃত সুখ—তাঁহাদের মত আমি ঠিক বলি না। কারণ, স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলিয়া মনের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না। এই দু তিন বৎসর ডাক্তারি পড়িয়া আমি দর্শনশাস্ত্রের অসারতা বেশ বুঝিয়াছি।

অমরের আজি কি জানি, কি হইয়াছে। সকালে আসিয়া দেখি—বাটীতে নাই। তাহার পর যদিও একবার শুভাগমন হল,—বেলা দশটার সময় কোথায় গিয়াছেন,—বারটা বাজিয়া গেল—এখনও দেখা নাই। পরের স্থান হইলেও আমি যজ্ঞবাড়ী ছাড়ি না। আর তাঁহার নিজগৃহে ষোড়শ উপচারের ব্যবস্থা;—তিনি কোথায় তার ঠিক নাই। অমর এক রকমের লোক। কিছুতেই আমোদ নাই; আনন্দ উৎসবে মন নাই। বুঝেছেন—কেবল পড়া। আর সদাই যেন অসুখ,—সদাই বিষণ্ণ মুখ। তবে ঐ বিষাদ-কালিমা অমরের মুখে বেশ দেখায়!

মা ত বলিলেন,—সমস্তই প্রস্তুত। আমারও আর বিলম্ব সহে না। খাবার সামগ্রী শীতল হইয়া গেল; আমার ক্ষুধাও নষ্ট হইয়া গেল। অমরকে ফেলিয়া খাইতেও মন সরে না। আসিলে আজি এক চপেটাঘাত লাগাইব,—আবার যদি সেদিনের মত চারি আঙুলের চারিটি দাগ বাস্ত বসে! বরং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তিরস্কার করিব।

এরূপ সময়ে আহারের কথাতেও প্রাণ শীতল হয়। আমি পাকগৃহের সম্মুখে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসিলাম,—'মা, ঝাল পিঠা অনেক করেছ ত ?'

মা ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিলেন,—'করিয়াছি। যত পারিবে খাইও।'

আমি। আমি সব পারিব ; সবই খাইব ;—দিবে ?

মা একটু হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—'আকবর সেই ছেলে বেলা যেমন ছিল—আজিও ঠিক সেইরূপ আছে। এত বড় হলে,—বিবাহ হল,—এখনও ছেলে মানুষ থাকিবে ?'

আমি। বেশ করিব, থাকিব।—মা, অমরেশ্বরের একটি বিবাহ দেও না। অমরের চেয়েও সুন্দর একটি মেয়ে আনিবে।

মা সস্মিত-মুখে বলিলেন,—'দিলজানের মত অমন সুন্দর মেয়ে কোথায় পাব ?'

আমি অবনত-মুখে সরিয়া গেলাম। বাড়ীর বাহিরে যাইতেছি,—অমর দৌড়িয়া ভিতরে আসিলেন। তাঁহাদের একখানি ভাল গালিচা ছিল,—সেই খানি লইয়া আবার দৌড়িয়া চলিলেন। আমাকে দেখিয়া কেবল একটু হাসিলেন। কথা কহিলেন না।

একে ক্ষুধার পীড়ন,—ভোজনেচ্ছা,—বিলম্ব,—তাহার উপর অমরের এই বৃথা কাজে আমার ক্রোধ জন্মিল। মৃদুপদে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখি,—প্রতিবাসী সুধাংশু-দের চণ্ডীমণ্ডপে গালিচাখানি বিস্তৃত হইয়াছে ;—নিকটে দাঁড়াইয়া ললিতকিশোর ও তাঁহার দুই বাবু-সহচর! সুধাংশু ও অমর—চণ্ডীমণ্ডপে উঠিবার সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান। সকলেরই মুখ অন্য দিকে আবর্ত্তিত ;—কেহই আমাকে দেখিলেন না।

আজি এই স্থানে ললিতকিশোরকে দেখিয়া আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। মৃদুপদে সম্মুখস্থিত ফলোদ্যানে প্রবেশ করিলাম।

অনেকক্ষণ বাগানের ভিতর ভ্রমিয়া, ঘাটের উপর বসিয়া শেষে বিরক্তচিত্তে বাহিরে আসিতেছি,—দেখি—ললিতকিশোর, তাঁহার দুই সহচর এবং সুধাংশু ও অমর চলিয়াছেন। বুঝিলাম—ভোজনের সময় উপস্থিত।

আমিও চলিলাম। মনে করিলাম,—অমর আমাকে অনেক অন্বেষিয়াও পান নাই। একবার ভাবিলাম,—ডাকি। কিন্তু তখনই নিবৃত্ত হইলাম; একটু ত্বরিতপদে ভোজনার্থীদের নিকটে আসিলাম। কিন্তু কেহই পশ্চাতে ফিরিয়া আমাকে দেখিলেন না। সকলেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অভিমান আসিয়া আমাকে বাধা দিল। অমর সকলকেই যত্ন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন;—আমার নামটি পর্য্যন্ত হইল না। এরূপ স্থলে আবার সামাজিক কথাও আছে। আমার আর পা উঠিল না; বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ললিত এক সহচরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'বিজয়কিশোর, অমরের বাড়ী দেখ।' তাহার পর বিকৃতস্বরে বলিলেন,—'পক্ষীর খাঁচা! এ ঘরে মানুষ থাকুক, গরুও থাকিতে পারে না। দেখ, অমর, এই শূকরালয়ে থাক বলিয়া তোমার মন ঐরূপ নীচ। প্রশস্ত ঘরে,—উচ্চ ঘরে থাকিলে মনও প্রশস্ত হয়,—উচ্চ হয়।

সুধাংশুর বাটীঘর একটু ভাল; নিজেও দীর্ঘায়ত-শরীর। তিনি বলিলেন,—'শরীরও প্রশস্ত হয়, উচ্চ হয়।'

মা সকলের অন্ন পরিবেশন করিলেন। ভোজন আরম্ভ হইল। ললিতকিশোর বলিলেন,—'এ যে বৈদ্যবাটীর শ্রাদ্ধ!'

মা বোধ হয় বৈদ্যবাটীর সংবাদ জানিতেন না। ললিতের

কথা শুনিয়া হয়ত মনে করিলেন,—তালুকদারতনয় পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার পাকের প্রশংসা করিতেছেন। মার কিন্তু ভ্রম ঘুচিতে বিলম্ব হইল না। ললিত বলিলেন,—'এ যে কেবল ঘাস; আমরা গরু নাকি?' অমরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'এ সব চাষা লোকের খাদ্য,—তোমাদের অমৃত; আমাদের মুখে এরূপ ব্যঞ্জন এই নূতন উঠিল। আর ভাতগুলি যে এক একটি—মর্ত্তমান রম্ভা।'

অমরের মুখে কথা নাই। চিত্রিত মূর্ত্তির ন্যায় উঠানে দণ্ডায়মান; কিছু দেখিতেছেন, শুনিতেছেন কিনা,—সজ্ঞান বা অজ্ঞান,—বলা যায় না।

ললিত বলিলেন,—'কিহে অমর, ওরূপে দাঁড়িয়ে কেন? একটু হেসে কথা বল। দেখ, আমি তোমার এই বাড়ীতে এসেছি;—এই ঘরে বসে, এই সব আহার করিতেছি। কোথায় তুমি আনন্দ করে বেড়াবে, না হয়ে—মুখে একটিও কথা নাই কেন?'

আমি মনে করিলাম,—তোমার এই অনুগ্রহে নিশ্চয়ই আজি অমরের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে স্বর্গে চলিলেন।

মা পরিবেশন করিতেছিলেন; তিনি বলিলেন,—'বাবা, অমর তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসে; সেই জন্য আব্দার করে তোমাকে এনেছে। তোমার উপযুক্ত খাবার কি এই, আগে যদি জানিতাম,—তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে, তাহা হইলে যেরূপে পারি, একরূপ আয়োজন করিতাম। নিতান্ত বালক;—সব ত বুঝিতে পারে না। এখন তোমরা ঐ অমরের মুখ চেয়ে একটু খাও। নহিলে ছেলে মানুষ বড় মর্ম্মপীড়া পাবে;—আমারও কষ্ট হবে।

মা মশলা-সুরভি মৎস্যের ব্যঞ্জন বাহির করিলেন। সেই মন-মাতান গন্ধ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিল। জঠরানল দ্বিগুণ

অলিন্দ। আর বাহিরে দাঁড়াইতে পারিলাম না। জাতিভেদ, সমাজনিয়ম, ললিতের স্বভাব—সমস্ত ভুলিলাম। আর এক দিন,—এই সে দিন—এইরূপ অবস্থায়, এইখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম,—ভিতরে গিয়া মার আদর পাইলাম; আজিও পাইবার আশায় ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমার বড় ভয়—পাছে ক্ষুদ্র রাক্ষসের দল ঝাল পিঠাগুলি সব শেষ করিয়া যায়।

অমর আমাকে দেখিয়াও কথা কহিলেন না। তাঁহার বাক্-রোধ হইয়াছে নাকি? মা দেখিয়াই বলিলেন,—'আকবর, কোথায় গিয়াছিলে বাবা; অনেকক্ষণ বলেছিলে—ক্ষুধা হয়েছে।'

আমি। যাব আবার কোথায়?—কে আমাকে ডেকেছে?

বক্রদৃষ্টিতে দেখিলাম,—ললিতকিশোর আমাকে দেখিয়াই ভোজন বন্ধ করিলেন;—আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অমরের কথা ফুটিল; আমার দিকে চাহিয়া একটু মৃদুস্বরে বলিলেন,—'তোমাতে আমাতে পরে খাইব। এখন বরং একটু বেড়াইয়া এস।'

আমি। এখন বেড়াইবার সময় কিনা! দুই প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে;—আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। কেনই বা আমি সকলের শেষে খাইব?

ললিতকিশোর ব্যঙ্গ করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন,—'না, মুসলমান সর্ব্বাগ্রে।'

মা বলিলেন,—'অমর, তুমি আকবরের স্থান করে দাও।'

সুধাংশুকিশোর বলিলেন,—'ললিত বাবু, মাছ অতি সুন্দর পাক হয়েছে,—খাও না।

ললি। আমি যবনের মুখ দেখিয়া আহার করি না।

সঙ্গী বিজয়কিশোর বলিলেন,—'ওহে, মুসলমান কুক্কুটী-চরণের কট্‌লেট্‌ বড় ভাল করে; খেয়েছ ত;—উহাদের অস্তিত্বে বিরক্ত হলে বরং ক্ষতি আছে।'

দ্বিতীয় সঙ্গী যোগেন্দ্রকিশোর বলিলেন,—'বাবুর্চ্চির কাজ করিবার জন্যই উহাদের সৃষ্টি; —যেমন পাঁঠার সৃষ্টি আমাদের ভোজনের জন্য।

'আর যেমন তোমাদের সৃষ্টি আমাদের জুতা-বরদারি করিবার জন্য'—কথাটি আমার মুখের বাহির হইয়াও হইল না;—মার মুখের দিকে চাহিবামাত্র মুখের কথা ওষ্ঠাধরে মিলাইল।

বিজ। আমি কিন্তু মুসলমানের পরিবেশিত চপ-কট্‌লেট্‌ খাই না। উহাদের মুখের গন্ধে বমনেচ্ছা হয়।

মা ব্যঞ্জনপাত্র হস্তে স্থাণু হইয়াছেন। অমর গোয়াল ঘরের সংলগ্ন চালাখানি সম্মার্জ্জনী-মার্জ্জিত করিতেছিলেন। তাঁহার হাত বন্ধ হইল। আমার রাগের বেগ তাঁহার উপর গিয়া পড়িল। তীব্রস্বরে বলিলাম,—'আমি গরু নাকি, তাই গোয়ালঘরে খাইব?'

ললি। না,—তুমি এসে আমাদের সঙ্গে বস। হিন্দুর বাড়ীতে ত কখন দেখি নাই—মুসলমান নিমন্ত্রণে আসে;—এক সঙ্গে খায়, সম্মুখে দাঁড়ায়। আমাদের জাতিনাশ আর অপমান করিবার জন্যই এই আয়োজন। চল, বিজয়।

ললিতকিশোর পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গীরাও উঠিলেন; সুধাংশুও উঠিলেন। রাগ ও জড়তার মধ্যেও আমার মনে হইল—ঝালপিঠাগুলির পরমায়ু আছে।

যাইবার সময় ললিত বলিয়া গেলেন,—'অমর, মনে যেন থাকে,—এই অপমানের ফল তুমি পাইবে। তোমার জাতি নাই; তুমিও মুসলমান।'

মা অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন,—'সমস্তই আমার দোষ। আর অমর, আমাদের কি বাপ, সে দিন আছে যে বড় লোকের আবাহন করিবে। দেখ দেখি—বড় লোক, দুপুর বেলা,—আহারে বসিয়া আহার হল না। ইহার অপেক্ষা আর দুঃখ কি বল দেখি। আকবর, তুমি যদি সকালে খাইয়া লইতে, তাহা হলে, আর এই দুর্ঘটনা হত না।

আমি খাইবার জন্য লালায়িত ছিলাম—সে কথা মার মনে আসিল না। অমরও সময় বুঝিলেন না,—আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা, অপমান, লাঞ্ছনা—কিছুই বুঝিলেন না। বলিলেন,— 'আকবর একটু বিলম্ব করিয়া আসিলে কি হইত?—সকলের সম্মুখে খাবার কথা বলিয়াই বা কি হল? ইহার পরে বসিলেই বা কি ক্ষতি ছিল? ললিতকিশোর বড় লোক—সকলেই জানে। মানীর মান রাখিতে কাতর কেন?'

আমার আর সহিল না। 'তোমাদের ভাত হারাম!'—বলিয়া বাহির হইলাম। মাথা মুণ্ড কত কি বলিতে বলিতে বাটীতে আসিলাম।

অমর যদি ললিতের নিমন্ত্রণের কথা পূর্ব্বে আমাকে বলিতেন, তাহা হইলে হয়ত এই দুর্ঘটনা ঘটিত না। কিন্তু আমাকে বলিতে তাঁহার বা তাঁহার জননীর সাহসে কুলায় নাই। মা হয় ত মনে করিয়াছিলেন,—বাড়াতে আনিয়া আমাদের দুজনের মধ্যে বিবাদ মিটাইবেন। মা ললিতকিশোরকে জানিতেন না। আবার ব্রাহ্মণ-চরিত্রের আদর্শ লইয়া মুসলমানের চরিত্র আপনার মনে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নিজের সম্মান বুঝে না; অপমান সহিয়া সহজে ভুলে,—অনায়াসে পরিপাক করে। স্বাপেক্ষিতা, স্বাবলম্বনও

কম। ব্রাহ্মণ আপনার সত্তা বজায় রাখিতে জানে না।—সে চেষ্টাও বড় নাই। মুসলমানে হিন্দুর অন্ত সমস্ত গুণ আছে;—তাহার উপর নিজের বল বুঝে; হয় ত একটু-আত্মগরিমাও আছে। ব্রাহ্মণের ন্যায় পরাপেক্ষী নহে,—আত্মবিসর্জ্জনেও অভ্যাস নাই। মা একে স্ত্রীলোক, আনম্র, ক্ষমাশীল—তাহাতে বহুদর্শন নাই। ওদিকে—অমর প্রণয়ে অন্ধ; সেই সহায়ে আজি অসাধ্য-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সহায়টা ভাল বটে; কিন্তু সকল সময়ে, সর্ব্বত্র অমোঘ-সন্ধান নয়;—হইলে জীবসংসারের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইত।

প্রতিজ্ঞা করিলাম,—অমরেশ্বরের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিব না; যত দুর সম্ভব—তাঁহার মুখও দেখিব না।

৫

যে দিন বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিব, সেই দিন রাত্রিতে শয়নের উদ্যোগ করিতেছি,—ধীরে ধীরে গৃহদ্বারে করাঘাত হইল; উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম; আবার সেই শব্দ। গৃহস্থিত তরবারিখানি হাতে লইয়া দ্বারসম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম; বলিলাম, 'কে?'

উত্তর। দ্বার খোল; আমি।

'অমর'—কথাটি মুখে আট্‌কাইয়া গেল। তরবারিখানি পার্শ্বে রাখিয়া দ্বার খুলিলাম। অমরেশ্বর গৃহমধ্যে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন। অভ্যর্থনা দূরে যাউক—কোন কথাই কহিলাম না।

অমর কহিলেন,—'আকবর'—। আমার দিকে চাহিলেন; সেই দৃষ্টি, সেই মুখের ভাব; সেই আমরা দুজন,—পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। কতকালের অন্ত প্রাণের ভিতর যেন ব্যথা লাগিল।

আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিমান। আলোকটুকু ঘোর আঁধারে ডুবিয়া গেল। কথা কহিলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরে অমর বলিলেন,—'আকবর, তুমি পলাও। আজ তোমার বাড়ীতে ডাকাতি হবে।'

আমি একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিলাম,—'আমার ঘরে অনেক ধন সঞ্চিত আছে। তুমি একবার ভাল করে দেখে লও—কোথায় কি আছে। আর কোনটায় লোভ হয় ত, এই বেলা লইয়া পলাও।'

অম। তোমার প্রাণের অপেক্ষা বেশি ধন আবার কি?

অমরের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। আমি বলিলাম,—'তোমার ললিতকিশোরকে বলিও,—আকবর মুসলমান, প্রাণের ভয় করে না; তাঁহার অভীষ্টও সিদ্ধ হবে না।'

অমর বিষণ্ণমুখে বলিলেন,—'আমাকে ক্ষমা কর; ললিত দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা প্রধান ধর্ম্ম—ক্ষমা ঐশ্বরিক।'

আমি। কালি অবধি কোরাণ সরিফ লইয়া তোমার নিকট গিয়া পড়িব;—তোমার মত মৌলবি আর মিলিবে কোথায়? দেখিতে এসেছ—আমি কেমন ভয় পাই; ভয়ের যন্ত্রণা কেমন ভোগ করি। দেখিয়া গিয়া তোমার দেবতার চরণে নিবেদিবে!

অম। আকবর, সমস্তই আমার দোষ। আমার জন্তই তোমার এই বিপদ্। এই মাত্র শিবুদাসের মেয়ে বেণী দিদির মুখে তোমার আসন্ন বিপদের কথা শুনিলাম—

আমি। আমি তোমার বক্তৃতা শুনিতে চাহি না। অন্তের কাছে গিয়া তোমার দেবতার পক্ষে ওকালতি কর। শিবুদাসের মেয়ে ডাকাতি করিতে আসে—আসুক। তুমি চলে যাও।

অম। আমার কথাটা আগে শুন।

আমি। তোমার কথা আর শুনিব না, ঘরের বাহিরে যাও।

অমর দুই হাতে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—'এখন সাবধান হও; আজি এ বাড়ীতে থাকিও না।'

আমি বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া বলিলাম,—'চলে যাও; তোমার ললিতকে বলিও,—আকবর তাহার ডাকাতের দলের ভয় করে না। বলিও,—আমি নিরস্ত্র নই; লোকজনও আছে। তুমি চলে যাও,—পার ত ডাকাতের সঙ্গে আসিও; তখন আর একরূপ অভ্যর্থনা পাবে। ঐ তরবারি দেখিতেছ?—সাবধান।'

অমর তরবারির দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহাকে দ্বারের দিকে চালিত করিলাম;—ঘরের বাহির করিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিলাম।

ডাকাতির কথায় পূর্ণ বিশ্বাস না হইলেও বাটীর সকলকে এবং প্রতিবাসী দুচারি জনকে ডাকিয়া ঐ কথা বলিলাম। তাহারা অন্তরূপ বুঝিল; এবং যথাসম্ভব সসজ্জভাবে জাগরিত থাকিবে—বলিয়া স্বস্বস্থানে চলিয়া গেল। দরিদ্র অথচ তরুণবয়স্ক দুই একজন প্রতিবাসী আমাদের বাটীতে থাকিয়া গেলেন।

আমি নিদ্রার প্রিয়পাত্র। আজি কিন্তু বোধ হয়—চিন্তার তাড়নায় ভীত হইয়া নিদ্রা সহজে আমার নিকট আসিল না। রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। সকল চিন্তা বিদায় দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। একমনে সেবা করিলেই ফল পাওয়া যায়;—আমিও পাইলাম।

বোধ হয় আধ ঘণ্টাও ঘুমাই নাই,—একটা বিকট চীৎকারে বিহ্বলের ন্যায় উঠিয়া বসিলাম। জানালা দিয়া বাহিরের উজ্জল আলোক গৃহের ভিতর আসিয়াছে, অনেক লোক মহা কোলাহল

করিয়া বাড়ীর সদর দ্বার ভাঙ্গিতেছে। আমার জড়তা ছুটিয়া গেল ;— সশস্ত্র ঘরের বাহির হইলাম; লোকজনকে ডাকিলাম; তাহাদেরও ভয় ও জড়তা ছুটিল,—সাহস পাইয়া বাহির হইল। বাড়ীর প্রবেশদ্বারে একটি ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গেল। আমাদের পক্ষে দুই জন হত, একজন আহত হইয়া ভূশয্যা গ্রহণ করিল। আমিও নিজে বাম স্কন্ধে তরবারির চোট খাইলাম। দস্যুদলের তিন চারি জন পড়িল। তখন বেগতিক দেখিয়া ডাকাতের দল রণে ভঙ্গ দিল ;—রক্তে ভূমি সিক্ত করিয়া, আপনাদের হতাহতদিগকে স্কন্ধে লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

রণজয়ী হইয়া মনে বড় উৎসাহ হইল ; জ্বালা যন্ত্রণা, ভয়, দুঃখ—সমস্ত সেই উৎসাহে ভাসিয়া গেল। আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক যথাসম্ভব চিকিৎসিত হইয়া প্রত্যূষে আবার শয্যাগ্রহণ করিলাম। উৎসাহের মুখে কতপ্রকার সুখ-দুঃখের চিন্তা ;—আমার পূর্ব্বপুরুষগণের দিগ্বিজয়—ভারতজয়ের চিত্র দেখিলাম। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরি, বাবর সাহ, আকবর সাহ, নাদির সাহ, —ক্রমে ক্রমে কল্পনায় চড়িয়া মনে উদয় হইলেন। আবার মুসলমানের অবনতি ;—যেরূপে দিন দিন আমরা পৃথিবীর নানাস্থানে লব্ধ রাজ্য ও চিরসম্মান হারাইতেছি,—যেরূপে ভারতের হেমদণ্ড আমাদের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে ; —আলমগীর ঔরঙ্গজীবের অসমদর্শিতা, বাহাদুরসাহের দুর্ব্বলতা, মিরজাফরের নির্ব্বুদ্ধিতা ;—নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পুলিসের হুড়াহুড়িতে বীতনিদ্র হইয়া গৃহের বাহিরে আসিলাম। আমার স্কন্ধে দারুণ বেদনা ও যন্ত্রণা— শরীরেও বড় জ্বালা। তাহার উপর আবার আহত, পীড়িত স্বজন-

বর্ষ লইয়া পুলিষের আদেশ পালন। ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম।

তদন্ত হইল, আমার এজাহার হইল; যাহা যাহা জানি—একরূপ বলিলাম;—কেবল অমরেশ্বরের কথা উল্লেখ করিলাম না। অমরকে লইয়া পুলিষে টানাটানি করিবে—এই ভয়ে তাহার কথাটা গোপন করিলাম কিনা ঠিক বলিতে পারি না।

তিন দিন পরে মামার টেলিগ্রাফ পাইলাম। মামা কলিকাতায় আসিয়াই টেলিগ্রাফ করিয়া ছিলেন। তাহার উত্তরে এই বিপদের কথা তারে ও পত্রে তাঁহাকে জানাইলাম। তারে সংবাদের উপর সংবাদ আসিতে লাগিল। জেলার দুজন প্রধান উকীল আমাদের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন। এখন আর অন্য চিন্তা রহিল না; কেবল শরীরের যন্ত্রণা। শয্যাশায়ী হইলাম। অমর কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার পত্রও আসিল; কিন্তু উত্তর লিখিলাম না।

মামা দেশে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দুএক জন মোক-দ্দমা-ব্যবসায়ী সর্ব্বরুধির-শোষক লোকও আসিয়া দেখা দিল। বাটীতে একটু ধুমধাম চলিল। আমার চিকিৎসাও হইতে লাগিল। আমরা বাড়ী ছাড়িয়া কয়েক দিন জেলায় আসিয়া বাস করিলাম। মোকদ্দমার তদন্ত চলিল। মামা হাকিমের আদেশ লইয়া আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

দিলজান মক্কা হইতে ধর্ম্মের ছালা বাঁধিয়া আনিয়া ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দশ পনর ছালা গল্পও কুড়াইয়া আনিয়া ছিলেন। সেগুলি আমার পীড়ার অবস্থায় কাজে লাগিল। আবার দিলজানের হাত দুখানি বড় সুন্দর;—জিন পরীরও তেমন সুন্দর হাত নাই।

সেই হাতে দিলজান কলিকাতার ভাল ঔষধ আবার স্কন্ধে লেপন করিতেন। এই সমস্ত একত্র হইয়া আমাকে ক্রমে সুস্থ করিয়া তুলিল।

প্রায় একমাস পরে মামা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ডাকাতির কোন কিনারাই হয় নাই—শুনিলাম। উপরিতন সাহেবদের ভ্রূকুটী সত্ত্বেও দস্যু ও নরঘাতকগণ আইন-আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইতে বসিল,—বুঝিয়া তখন অমরেশ্বরের কথা মামাকে বলিলাম। মামা সকল কথা লিখিয়া তাঁহার জেলার উকিলদিগকে জানাইলেন।

৬

মধ্যে মধ্যে গোলদীঘীর দিকে বেড়াইতে যাই। মনের ভিতর হয় ত একটু ইচ্ছা ছিল—অমরেশ্বরের সহিত দেখা হয়। কিন্তু সে কথা মনেও স্বীকার করি না;—অথচ গোলদীঘী বেড়ানও একবারে ছাড়িলাম না।

এক দিন ললিতকিশোরকে দেখিলাম। গোলদীঘীর ধারে বৈরাগী-বাবু রামায়ণ দত্তের সহিত কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন হইয়া বেড়াইতেছেন। সহসা দুজনকে একত্র দেখিয়া মনে আঘাত লাগিল;—একটু দাঁড়াইয়া ফিরিলাম। অমনি ললিতকিশোর উচ্চস্বরে ডাকিলেন,—'ওহে চাচা, এই দিকে এস,—একটু অভ্যর্থনা করে যাও।'

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া দাঁড়াইলাম,—দেখিলাম,—ললি-তের দিকে চলিলাম।

রামায়ণ কহিলেন,—'তালুকদার, এই কি তোমার কাজ! আমরা তোমার অনিষ্টে আছি—এ কথাও তোমার বিশ্বাস হল?— তাই তোমরা অনর্থক আমাদের সঙ্গে এই বিবাদ বাধাইলে।'

ললিত একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন,—'ও পাতি নেড়ে যত করিতে পারে—করুক্ না। তবে চাচা, একবার আমাদের হাতে বেঁচে গিয়াছ বলে বড় বুক বলে গিয়াছে! আবার অমরকে সাক্ষী মেনেছ,—অমর গিয়া আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে,—না? আমি ত ডাক-ফুকার স্বীকার করিতেছি—আমরা এই দুজন;— তোমাকে খুন করিবার জন্যই ডাকাতি;—শুনেছ ত চাচা?—ওদের সে সাহস হত না। ওরা তোমাকে কোন রকমে জেলে পুরি- বার চেষ্টায় ছিল। ওদের ক্ষমতা ঐ পর্য্যন্ত। আমি শুনে, নিজে ওদের বাড়ীতে গিয়ে,—এখন বুঝেছ চাচা?—জেলে দেওয়া আবার কি?—হাত আছে, অস্ত্র আছে,—এক বারে শেষ;—শত্রু নিপাত! মহাভারত আবার বলে—জীবহত্যা!—তোমাকে মারলে আকি আবার জীবহত্যা।' রামায়ণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'বরং রামায়ণ বুঝে ভাল।—সেই দিনেই নিষ্কণ্টক হওয়া যাইত,— কেবল ঐ হতভাগা অমর এসে হাজির হল বলে কাজ হাসিল হল না। এই ত স্বীকার করিতেছি,—কিন্তু আমাদের ছোঁও দেখি। তোমার মত চাষা ভুসার কাজ নয়।'

রামা। কষ্টভোগ আমার ঐ গরিব পণ্ডিতের;—এই টানা- পড়েন; কালি সকালে জেলায় যেতে হবে।

ললি। যাই কর চাচা,—এখন ত প্রমাণ চাই। অমরের দ্বারা হবে না;—সে ত আমার গোলাম; আবার তারও প্রাণের ভয় । বুঝেছ চাচা?—আর যে দিন এই মোকদ্দমায় জিতিব,

সেই দিন যমের বাড়ী থেকে তোমার নামে ওয়ারেন্ট জারি হবে।

রামা। আবার তার পরের মেও সাম্‌লাইতে তোমার শ্বশুর-মামা ওরফে মামা-শ্বশুরের বাড়ী বিক্রয় হবে।

ললিতের কথায় আমার বুকের ভিতরটা একটু কাঁপিল। যে সকল কথা শুনিলাম,—প্রায় সমস্তই আমার কাছে নূতন। এসব সংবাদ কিছুই রাখিতাম না। এখন যেন একটা অকারণ ভয়ের ছায়া মনের উপর পড়িল। কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। ললিত আমার পশ্চাতে দিলজানের নাম লইয়া উপহাস-মিশান কুৎসিত গালি ছুড়িতে লাগিলেন।

অমরের জন্যই বোধ হয় বুকের উপর ভার বসিল। এখন আবার তাঁহার জন্য মাথা-ব্যথা কেন? তাঁহার সম্বন্ধে উদাসীন হইলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়। আর ললিত?—এত দিন অমরের মধ্যস্থতায় আমার জীবনের সহিত দুষ্ট ললিতের সম্বন্ধও দুশ্ছেদ্য ছিল। এখন ত সেই রক্তহীন মনুষ্য-পাষাণ অমরকেও বিসর্জ্জন দিয়াছি। এখন আবার কিসের অনুরোধ,—এখন আবার সেই যন্ত্রণা কেন?

সময়ে সময়ে অমরের কথা মনে পড়ে। কত দিন ধরিয়া অমরকে বিদ্বেষ ও ঘৃণার পঙ্কিল জলে ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু পারিতেছি না। ইহাও এক বিপদ। ধরিতে গেলে সংসার এখন আমার সম্মুখে আফুল্ল-গোলাপের বাগানের মত—হাস্যময়, সৌরভময়, শোভাময়, সুখময়। প্রাণের ভিতর যেন গোলাবের লহরী খেলিতেছে,—যেন সুরভি-শীতল প্রভাতসমীরে মৃদু মন্দ নাচিতেছে। যেন বাল-তপনের কোমল করে সমস্ত উজ্জ্বল। কেবল

ঐ অমর সময়ে সময়ে আসিয়া কাল মেঘের মত সমস্ত ঢাকিয়া দিতেছে। সম্বন্ধ ত কাটাইয়াছি,—তবে আবার আসে কেন ?

আমার মনে হয়,—অমরের উপর আমার মায়া যায় নাই। সে মায়া আমার অস্থি-মাংসে জড়িত; আমার প্রতিশিরায় রক্তের সহিত সেই মায়া বহিতেছে,—হস্তে, পদে, বুকে, মুখে, মস্তিষ্কের ভিতর সেই মায়ার স্রোত চলিতেছে। উজ্জ্বল নয়ন-রঞ্জন সকল বর্ণেরই আতিশয্যে সর্ব্ববর্জ্জিত কৃষ্ণবর্ণ উৎপন্ন হয়। আমারও অমরের প্রতি বর্ত্তমান ঘৃণা—বোধ হয়, মায়ার আতিশয্য মাত্র। ঈর্ষাই হয় ত এই অসঙ্গত আতিশয্যের মূল। ললিত সরিয়া গেলেই ঈর্ষাটুকু যায়,—তন্মূলক আতিশয্যও যায়;—মায়া স্বাভাবিক তরলভাব ধারণ করে,—সেই মনোরঞ্জন প্রেমভাব আবার আসিয়া দেখা দেয়; আমার সর্ব্ব-সুখময় জীবন-পথের কণ্টকটি দূর হয়।

অমরের কি বিপদই উপস্থিত! ললিত-মন্ত্রের উপাসক অমর সত্য কথা কহিয়া ইষ্টদেবতার অনিষ্ট সাধিবেন,—না মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া চিরকালের জন্য পাপপুরুষের নিকট আত্মবিক্রয় করিবেন? এমন উভয়-সঙ্কটে কখন কোন মানুষ পড়িয়াছে কি না জানি না। এখন আমি যদি ললিত-কণ্টকটি উপড়াইয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে অমরেরও বিপদ ঘুচিয়া যায়।

কি কুক্ষণেই শিবুদাসের মেয়ের কথা মামাকে বলিয়াছিলাম। আমিই অমরকে এই বিপদে ফেলিয়াছি। অমর ভাবিয়াছেন,—আমি প্রতিশোধ লইতেছি। যে মূল পাপী, তাহার কিছু করিতে পারিলাম না; ভালমানুষ অমরকে যন্ত্রণা দিতেছি। আবার ভাবিলাম,—ললিতই ত অমরের যন্ত্রণার মূল। অমরকে বিপদে

ফেলিয়াও সন্তুষ্ট নয়,—পাপী আবার দিলজানের পবিত্র নাম লইয়া উপহাস করে!

প্রবল প্রতিহিংসা আসিয়া দেখা দিল। শরীরে জ্বালা ধরিল। মন বড়ই উত্তেজিত হইল; কিরূপে প্রতিহিংসা সাধিব,—ঠিক করিতে পারিলাম না।

নানা দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া বাড়ীতে আসিলাম। ললিতের মুণ্ডপাত কামনা করিলাম। দিলজান নানা কথা বলিয়া ক্রমে ক্রমে সে দিনের সমস্ত ঘটনা বাহির করিয়া লইলেন। বলিলেন,— 'আমি ললিতকে জব্দ করিয়া দিতেছি। তুমি অমরেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া আমার কাছে আন। তাঁহাকে ভাত খাওয়াইয়া মুসলমান করিয়া দিব। মুসলমানের উপর ললিতের বড়ই ঘৃণা। এক ভাতে দুজনের মুণ্ডপাত হবে।'

আমি। তোমার মুণ্ডপাত হবে।

দিল। সে তোমার আমার এক সঙ্গে। এক কবরে দুজনে যাব।

আমি। তুমি আগে যাও।

দিল। তাও কি হয়; একে তুমি হলে—আমার ফুফুর বেটা ভাই। তাতে আবার এখন খসম হয়েছ। তোমাকে কি ফেলে যেতে পারি?—তা হলে তুমি যে কেঁদে সারা হবে।

আমি। তুমি কবরে শুয়ে কাঁদ গিয়ে। আমি কাঁদিব না।

দিল। তুমি এখনই কাঁদিতে আরম্ভ করেছ;—ঐ তোমার চখে জল এসেছে।

আমি। আমার সঙ্গে বড় লাগিও না। তা হলে তোমার বিদ্যা সকলকে বলে দিব। তুমি আমার নাম করে রোজ নমাজ পড় কেন? এই বয়সে নমাজে এত ভক্তি কেন?

দিল। আমি—আল্লা হো আকবর—বলি; আমি বুঝি তোমার নামে নমাজ করি।

আমি কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিলাম,—'ঠিক বল দেখি,—কর কি না?'

দিলজান আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—'তুমি ছাড়া আমি ত আর কিছুই জানি না।'

দিলজানের অমৃতময় স্পর্শে অভিমান ও অপমানের জ্বালা যুড়াইল। পৃথিবীতে কত লোকে আমার ন্যায় গৃহকোণে মধুচক্র ফেলিয়া—পর্ব্বতে, কান্তারে, বনে, জঙ্গলে প্রাণ হাতে লইয়া, মধুর অন্বেষণে ভ্রমিয়া বেড়ায়! গৃহাঙ্গণে মনোমোহন গোলাপ ছাড়িয়া সৌরভের আশায় পথে পথে ভ্রমণ করে।

পরদিন কালেজের বাহির হইয়া অমরেশ্বরের অনুসন্ধানে চলিলাম। শুনিলাম,—তিনি জেলায় চলিয়া গিয়াছেন। সাক্ষ্য দেওয়া এড়াইবার জন্য তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ কেহ তাঁহাকে পলাইতে বলিয়াছিল। শুনিলাম,—রাজার আদেশ অমান্য করিয়া একটি নূতন অপরাধ করিতে তিনি অসম্মত হন। ললিত জানিতেন—অমর আদালতে তাঁহার দোষ কাটাইয়া দিবেন। সুতরাং তিনিই নাকি উদ্যোগী হইয়া অমরকে পাঠাইয়াছেন। অমর কিন্তু এক অদ্ভুত জন্তু। চলিবার সময় কত পা মাটি হাঁটেন, তাহাও গণেন কি না—বলা যায় না। এইবার তাঁহার প্রকৃত পরীক্ষা।

৭

চিরকাল হিন্দুদিগের সংসর্গে থাকিলেও আমি অদৃষ্টবাদী নই। সে বিষয়ে আমি পাকা মুসলমান। অদৃষ্ট আমাদের কাজ নিয়মিত করে—ইহা কখনই মানিতাম না। কিন্তু আমার জীবনের ঘটনাগুলি ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়,—যেন একটা নাশিনী শক্তি আমার জীবনপথে সময়ে সময়ে দেখা দিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। অনেক লোকেরই বোধ হয় এইরূপ ঘটে। অমরের বোধ হয় একটা রক্ষিণী-শক্তি সহায় আছে। তাঁহার হার-জিত এখনও বুঝা যায় না। কিন্তু যত দূর বুঝি,—আমার হার হইতেছে; ললিতেরও হার। গতিকে বোধ হয়—অমর জিতিবেন। মাধব বাবুর স্কুলে ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার ন্যায় জীবনের কঠোর পরীক্ষাতেও তিনি জিতিবেন। তাঁহার মত ওরূপ টিপিয়া চলে কে!

হিন্দুশাস্ত্র মতে এই নাশিনী শক্তিই অদৃষ্ট কি না—জানি না। তবে আমি ইহার সত্তা, ইহার বল—অনেক বার অনুভব করিয়াছি। আবার এই সময়েও ঐ শক্তি আসিয়া আমার স্কন্ধে চাপিল।

কয়েক দিন নানাপ্রকার দুশ্চিন্তার সেবা করিয়া আমার মাথা গুলাইয়া গেল। শনিবার সন্ধ্যার পর কখন কখন ক্লবে যাইতাম; আজিও চলিলাম। দিলজান অনেকবার বারণ করিলেন; শেষে দেখিলাম—তাঁহার চক্ষে একটু আরক্তিমা। তখন একটু মুখ ভার করিয়া বসিলাম। দিলজান বলিলেন,—'ক্লবে গিয়ে, তর্ক করে কি ধর্ম্ম-শিক্ষা হয়! বরং ঘরে বসে কেতাব লয়ে দিলজান বিবির কাছে পাঠ লও। দাড়ি চুলে চুণ মাখায়ে শাদা কর; দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা বড় মোল্লা হয়ে পড়্‌বে।'

এমন সারগর্ভ বক্তৃতা আজি মর্ম্মস্পর্শ করিল না। দিলজান

কার্য্যান্তরে ঘরের বাহিরে গেলেন ; আমিও নাশিনী শক্তির প্রবর্ত্তনায়, নিশাভ্রমণের নিয়মানুসারে, গরম কোট গায়ে চড়াইলাম ; পকেটে পিস্তল রাখিলাম এবং ছড়ি হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইলাম।

প্রায় অর্দ্ধরাত্রে সভাভঙ্গ হইল। আমিও বাটীর দিকে চলিলাম।

শনিবার কলিকাতার রাস্তায় নিশাচর-বাবুদলের একটু ভিড় হয়। আমি ভাবিতে ভাবিতে একটা গলির মুখের নিকট আসিয়াছি,—এক দল রণরঙ্গ-মত্ত বাবুর সম্মুখে পড়িলাম।—চাচার কাছে কি আছে দেখ—বলিয়া তাঁহারা আমার দিকে টলিলেন। আজি পর্য্যন্ত পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কাহাকে বলে—জানিতাম না ;—আজি কিন্তু ছুটিলাম। দুই এক জন আমার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন,—একটু আসিয়া ঝড়ে উন্মূলিত তালগাছের ন্যায় পড়িলেন ; আবার সঙ্গী-দিগের সপাদুকা-পদাঘাত ও মধুময় অশ্লীল সম্বোধনে চেতনা পাইয়া উঠিলেন। তাহার পর সকলে শৃগাল-গর্দ্দভ-ছাগ-বিড়ালাদির অনু-করণ শব্দে দেশের লোক জাগাইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেলেন।

শুনিয়াছিলাম—ললিতকিশোর না কি নিশাচর হইয়া উঠিয়াছেন। বাবুর দলের হাতে পরিত্রাণ পাইয়াই মনে হইল—একটু রাস্তায় থাকিলে,—একটু এদিক ওদিক খুঁজিলে হয় ত ললিতের দেখা পাইব। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় একবার দেখিয়া যাই। আর—আর—যদি বাড়াবাড়ি করেন,—ভাল করিয়া শিখাইয়া দিব। ললিত জানেন না—মুসলমান কি উপাদানে গঠিত।

ললিতের সে দিনের কথা মনে পড়িল ;—নাশিনী শক্তিও আসিয়া জুটিল। কে জানে—কেন ?—প্রায় সমস্ত রাত্রি পথে পথে ফিরিলাম। দূরে কুক্কুট উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার

বুক কাঁপিল। দাঁড়াইলাম; একটু হাসিলাম; ভাবিলাম—শিশুকাল অবধি হিন্দুদের মধ্যে বাস করিয়া, তাহাদের গ্রন্থ পড়িয়া, অমরের সঙ্গে বেড়াইয়া, আমিও মনের ভিতর হিন্দু হইয়া গিয়াছি। নহিলে আজি আমার বুক কাঁপিবে কেন? আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই আরবি তেজ—যে তেজে এক দিন মোরোক্কো হইতে চীন পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ জ্বলিয়া উঠিয়া ছিল;—যে তেজের সম্মুখে পিরানিস্, ককেসস্ ও হিমালয় উন্নত মস্তক নত করিয়াছিল;—ডানিউব, নাইল, সিন্ধু ও গঙ্গা আপনাদের বিস্তীর্ণ বক্ষের উপর দিয়া বিজয়ী সেনার পথ দিয়া ছিল,—সে তেজ বুঝি রক্তের সহিত আমার শিরায় আর খেলে না;—নতুবা অকারণ-আতঙ্কে বুক কাঁপিবে কেন?

কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া ফিরিলাম। সরকারি বেড়া-পুকুরের ধারে বাগানের মধ্যে আসিয়া বসিলাম।

রাত্রির অন্ধকার সরিয়া যাইতে লাগিল; দুই এক জন বায়ু-ভোজী রোগ-বাতিকগ্রস্ত বাবু পথে দেখা দিলেন। আমারও বুঝি ইচ্ছা পূরে! আবার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের একটু উষ্মা। বাবু ললিতকিশোর একটু আলু থালু বেশে বাগানের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আজিও সঙ্গে বিপর্য্যস্ত-কেশ-বসন ঈষৎ-চঞ্চল-চরণ, মহাভারতনন্দন কণ্ঠিধারী বাবু রামায়ণ। আমি দীর্ঘকোটের নিম্নস্থিত পিস্তলটি একবার স্পর্শ করিলাম;—একটু অগ্রসর হইলাম।

ললিতকিশোর তাঁহার সেই হাড়-জ্বালানে স্বরে বলিলেন,—“কি,—এই যে আমাদের সর্দারের বেটা খাঁসাহেব; চটিও না সাহেব; তোমাদের মধ্যে মুটে-মজুর-মিস্ত্রি-সর্দার থেকে তালুকদার, তার পর খাঁ সাহেব, তার পর সৈয়দ সাহেব,—এক জন্মেই সব হওয়া

যায়। কিঞ্চিৎ—যৎকিঞ্চিৎ—পাজামা-চাপকানের মত—কড়ি জুটিলেই হল।

রাগে অন্ধপ্রায় হইয়া বলিলাম,—'এখন ত ভরসা—চুরি, ডাকাতি, ফেরেবি। এখনও এত তেজ!'

ললিত তাঁহার আরক্ত বড় বড় চক্ষু ঘুরাইয়া কোটের ভিতর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন,—'সাবধান—খাঁ সাহেব,—তোমার জন্যই এই পিস্তল—দেখিতেছ?'

আমি হস্তস্থিত লাঠির প্রহারে ললিতের পিস্তল তাহার হস্তচ্যুত করিলাম; পিস্তল ছট্‌কাইয়া একটু দূরে গাছের ভিতর সশব্দে পড়িল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের পিস্তল বাহির করিয়া ললিতের সম্মুখে ধরিলাম।

চীৎকার করিয়া রামায়ণ আমার হাত ধরিলেন। কে জানে—সে সময়ে আমার মনের কি ভাব। কি একটা অস্বাভাবিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, বিরক্তি—কি যেন একটা সন্দেহ,—কি ভাব-মিশ্রণ—ঠিক বলিতে পারি না। আমি হয় ত হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম; হয় ত সেই চেষ্টাতেই,—অথবা হয় ত ইচ্ছা-প্রযুক্ত অঙ্গুলি-সঞ্চালনে—ঠিক বলিতে পারি না, ঠিক জানি না,—কিছুই মনে নাই,—পিস্তলের ঘোড়া পড়িয়া গেল;—শব্দ হইল;—আমার হাতও বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পাইল। একটা অব্যক্ত চীৎকার;—রামায়ণ বোধ হয় ঘুরিয়া ললিতের উপর গিয়া পড়িলেন। আমার চক্ষে যেন জাল পড়িয়া গেল; আমার পূর্ব্বসংকল্প, রাগ, প্রতিহিংসা কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় আর কিছুই দেখিলাম না। বোধ হয় পিস্তলটা কাপড়ের ভিতর রাখিবার চেষ্টা;—সেই চেষ্টায়—কি জানি

কিরূপে—দ্বিতীয় নলের ঘোড়া পড়িয়া গেল;—বাম হস্তে বেশ দারুণ আঘাত লাগিল; বিশেষ বেদনা অনুভব করিলাম না। সেই সময়ে ধর্ ধর্ শব্দ;—দূরে, নিকটে লোক ছুটাছুটি—আভাসে দেখিলাম,—বুঝিলাম। নিজেও দৌড়!—বাগানের লোহার বেড়া ডিঙাইয়া দৌড়;—রাস্তা পার,—গলির ভিতর,—গলি—লোকের বাড়ীর পাশ,—নর্দ্দামা,—গলি,—দৌড়। বোধ হয় পাঁচ সাত মিনিট।—কোথায় কোনও লোক,—কেহ উঠিয়াছে, কেহ দ্বার খুলে নাই, কেহ দৌড়িয়া আসিল,—নর্দ্দামায় নামিয়া থামিল;—দৌড়, লাফ, দৌড়;—বাড়ীর খিড়কির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। ভিতরে ঘরের দেওয়ালের গায় পাকা সরু নর্দ্দামা,—বাম পদ তাহার ভিতর পড়িয়া গেল; আমিও পড়িলাম,—উঠিলাম,—দাঁড়াইতে পারিলাম না; আবার পড়িয়া গেলাম। চৈতন্যের পূর্ণ অস্তিত্ব-জ্ঞান না থাকিলেও চৈতন্য ছিল;—এখন বোধ হয় গেল।

কতক্ষণ পরে জানি না,—বোধ হয় অল্পক্ষণ,—চাহিয়া দেখি,—দিলজান ও তাহার দাসী সমিনা আমাকে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে আমার রুদ্ধশ্বাস—বোধ হয় অবকাশ পাইয়া—দীর্ঘ-নিশ্বাস হইয়া বাহির হইয়া গেল;—সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনাও লইয়া গেল।

চারি দিনের পর চৈতন্য পাইলাম। চাহিয়া দেখিলাম—পার্শ্বে সমিনা। আমার বাম হাত ও বাম পদ উঠে না। আজি জানিলাম—আমার বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ পিস্তলের গুলিতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাম পাখানিও ভাঙ্গিয়াছে,—যন্ত্র মধ্যে বাঁধা আছে। তাহার উপর আবার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। বিদ্যুতের ন্যায় সে দিনের ঘটনাগুলি মনে আসিল,—আবার যেন কোথায় উড়িয়া গেল। এই ভাবে কত

কত গেল—বলিতে পারি না। মামা সাহেব-ডাক্তার সঙ্গে লইয়া গৃহ মধ্যে আসিলেন। তাঁহারা আমার হাত পা খুলিয়া দেখিলেন, জ্বর দেখিলেন,—কত কি পরীক্ষা করিলেন। মামা বলিলেন,—'আঙুলটা কাটিয়া ফেলিলে হয় না?' ডাক্তার সাহেব বলিলেন,—'জ্বরটা বড়ই বেশি। তুমি সময় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ। আজিও যাউক।'

অর্দ্ধ চেতনাবস্থায় মামার ও সাহেবের কথা শুনিলাম। একবার যেন ডাকিলাম,—মামা। মামা যেন তিরস্কারের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। দিলজান দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন;—তাঁহার দিকে চাহিলাম। প্রকৃতই চাহিলাম, অথবা চাহিলাম বলিয়া মনে হইল মাত্র—ঠিক বলিতে পারি না। দিলজানও বোধ হয় আমার দিকে চাহিলেন; সেই দৃষ্টি—সেই সজল অথচ যেন অনল-ময় দৃষ্টি; – আমার প্রাণ যেন সেই অনলে অনলময় হইয়া গলিয়া গেল;—গলিয়া গলিয়া, আরও গলিয়া, যেন অত্যুষ্ণ কালিম বাষ্প হইয়া উঠিল। সেই বাষ্পের তেজে শরীর যেন ফাটিতে লাগিল। সে কি যাতনা! আমি আবার চেতনা হারাইলাম।

কঠিন পীড়ায় পড়িলাম। কখন চেতন, কখন বা অর্দ্ধচেতন অবস্থায়। দেড় মাসের পর পূর্ণ সংজ্ঞা পাইলাম। দেখিলাম,—দিলজানের লাবণ্যময় মূর্ত্তিতে বিষম কালিমার ছায়া পড়িয়াছে। তাহার অসাক্ষাতে সখিনাকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম—জেলায় ও কলিকাতায় উভয়ত্রই ঘোর মোকদ্দমা চলিতেছে। জেলার মোকদ্দমায় অমরেশ্বর সাক্ষ্য দিয়াছেন। ললিত, রামরতন ও মহাত্মাত্রয় আমাকে খুন করিবার জন্য লোক দিয়া ডাকাতি করেন;—সেই উপলক্ষে নরহত্যা হইয়া যায়;—অমরের সাক্ষ্যে সমস্ত প্রমাণ হইয়া

গিয়াছে। আমি রামারণকে হত্যা করিবার প্রয়াসে অপরাধী। কিন্তু পুলিষ ললিতকিশোরের পিস্তল বাগানে গাছের মধ্যে পাইয়াছেন। যে সাহেব ললিতকে পিস্তল বিক্রয় করেন, তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে মোকদ্দমার সুবিধা হইয়াছে। ললিত বারিষ্টারের জোরে জামিনে ছিলেন; এখন পলাইয়াছেন ;—তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না। সাক্ষ্য দিয়াই অমরেশ্বর পীড়ায় পড়িয়াছেন; তাঁহার জীবন সংশয়।

কি অশুভ জীবন লইয়াই জন্মিয়াছিলাম। এক আমার দোষে আজি কতগুলা লোকের দারুণ কষ্ট;—কতগুলা লোক প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে। এখন আমার পাপও বা ললিতের শিরে যায়। আবার যাহারা আমাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসে, আমার জন্যই আজি তাহাদের কি ঘোর বিপদ!

মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোর বিভীষিকাময় চিত্র আমার রোগ-দুর্ব্বল চিত্তে অঙ্কিত হইল। সখিনা কত কথা বলিল ;—কতক শুনিলাম, কতক শুনিলাম না ; কতক বুঝিলাম, কতক বুঝিলাম না ;—বুকের ভিতর, মাথার ভিতর, শরীরের ভিতর যেন কি হইতে লাগিল। যেন উপরে উঠিতে লাগিলাম ;—আবার যেন আছাড় খাইয়া নীচে পড়িলাম ; শরীরে কি আঘাত লাগিল—বলিতে পারি না ; কারণ চেতনা একবারেই চলিয়া গেল।

এক দিন সন্ধ্যার সময় জানালা দিয়া সূর্য্যের ক্ষীণালোক আমার মুখের উপর পড়িয়াছে,—আমি চক্ষু চাহিলাম ; দেখিলাম—দিলজান তাঁহার কঙ্কালসার হাতখানি আমার বুকের উপর রাখিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। বলিলাম,—'দিলজান।' দিলজান শিহরিয়া উঠিলেন; আমার মুখের দিকে চাহিলেন ;—

অমনি তাঁহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে চাহিয়া একটিও কথা না বলিয়া দিলজান ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

আমি শূন্যদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সমিনা আমার পদপ্রান্তে বসিয়াছিল; অনেক ক্ষণের পর দেখিয়া বলিলাম,—'সমিনা, দিলজান কোথায় গেলেন?'

সমি। বোধ হয় ডাক্তার সাহেবের ঘরে গিয়াছেন। আপনি কথা কহিবেন না।

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম,—'দিলজানও কি পীড়িত?'

সমিনা উত্তর করিল না। একটু পরে বলিলাম,—'কথা বল না কেন?—দিলজানের কি পীড়া?'

সমি। আপনাদের পীড়া,—আর এই সব বিপদই দিলজানের পীড়া।

আমি। আর কার পীড়া? মামা কি পীড়িত?

সমি। তিনি রক্ষা পান কি না।—আর কথা বলিবেন না; রোগ বাড়িবে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসিলাম,—'মোকদ্দমার কি হইল?'

সমি। মোকদ্দমায় আমাদের জিত হয়েছে। আপনি খালাস পেয়েছেন। মহাভারত দত্ত—আর তার ছেলের পুলিপোলাও যাইবার হুকুম হয়েছে।

আমি। মহাভারতের ছেলে সেরে গেছে?

সমি। প্রায় সেরেছে,—শুনেছি।

আমি। ললিত?

সমি। সে আত্মহত্যা করেছে।

আবার প্রাণের ভিতর জ্বলিয়া উঠিল; মাথার ভিতর আগুন জ্বলিল; নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

সমিনা দেখিয়া বলিল,—'আর কোন কথা জিজ্ঞাসিলে জবাব দিব না। চুপ করিয়া থাকুন।'

অনেক ক্ষণের পর বলিলাম,—'সমিনা, আর একটি কথার উত্তর দাও; অমরেশ্বর কেমন আছেন,—তিনি কোথায়?'

সমি। তিনি বাড়ীতে; শুনেছি—তাঁর সঙ্কট রোগ।

মানুষের প্রাণে যতদূর সহে—তাহা সহিলাম। দুঃখের কথা,—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা সংক্ষেপে বলিয়া লই: পাপীর কথা যত কম হয়, ততই ভাল। দুই দিন পরে মামা দেহত্যাগ করিলেন। তাহার পর এক মাস—এক সুদীর্ঘ মাস—এক মর্ম্মান্তক যাতনার মাস,—সেই লাবণ্যময়ী, পুণ্যময়ী, স্নেহময়ী, আনন্দময়ী দিলজান এই ঘোর পাতকীকে ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমার জীবনকাহিনী শেষ হইল! হো হো,—আমার কথা শেষ হইল!

কই, শেষ হইয়াও ত হয় না। তিন বৎসর হইল,—মামা ও দিলজান আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই তিন বৎসরের ঘোর যাতনাতেও প্রাণ ত গেল না।

মামা অর্থবলে, সহায়বলে আমাকে রাজদণ্ডে বাঁচাইলেন। না বাঁচাইলেই ভাল হইত। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত ;—এই অসহ্য যাতনাও সহিতে হইত না।

আমার পাপে ললিত প্রাণ হারাইলেন। রামায়ণকে বধ করিবার প্রয়াস না থাকিলেও জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ আমি তাঁহাকে আহত করিলাম ;—সেই আঘাতে তাঁহার জীবননাশও হইতে পারিত ;—কিন্তু দোষ বর্ত্তিল ললিতের উপর। চিরকলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া ললিত চলিয়া গেলেন।

মৌলবী সাহেব বলেন,—একের পাপে অন্যের দণ্ড হয় না। ললিত নাকি প্রাণ দিয়া তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। আর এই বর্ত্তমান যাতনায় নাকি আমার প্রায়শ্চিত্ত হইল। ললিত ত এড়াইলেন ;—আমার দণ্ডের কি অবসান নাই !

আর ললিতের ছোট ছেলে দুটি,—তাহার পরিজনবর্গ,—এই কলঙ্কের ভাগ তাহাদের স্কন্ধেও পড়িল। আবার আমার দোষেই তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইল। তাহাদের কি অপরাধ ?

মৌলবী সাহেব এবং আর সকলে আমাকে আবার বিবাহ করিতে বলেন। আমার মত বিবাহ জগতে আর কেহ করে নাই !—আবার বিবাহ !—ক্ষোভের কথা এই—অমরেশ্বর বিবাহ করিলেন না। কিরূপেই বা করিবেন ? তাঁহার ওকালতি পরীক্ষা দেওয়া হইল না। দেশে মাষ্টারি করিয়া যাহা পান,—ললিতের পরিবারদিগকে খাওয়াইতেই সব যায়। অমরের কষ্ট যতই হউক, মার মনের আশা যে পূরিল না,—এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না। আমি তাঁহার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—কই, তাহা ত পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

অমর, লোকে আত্মজীবন ত্যাগ করিয়াও সত্যের সম্মান রাখিতে পারে। তাহার অধিক করিতে হইলে কেহ সত্য হারায়,—কেহ বা কাপুরুষের মত আত্মহত্যাই করিয়া বসে। অন্যে যাহা পারে না, তুমি তাহা করিলে,—তোমার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় ললিতকে বিসর্জ্জন দিলে।—তুমি মহাপুরুষ! তুমিই ধন্য! এই আত্মত্যাগের আঘাত সামলাইতে গিয়া তোমার নিজের প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্যই বোধ হয় সেই মঙ্গলালয় দয়াময় নিদান তোমাকে রক্ষা করিলেন।

তোমাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কি বলিয়া তোমার কাছে মুখ দেখাইব। তোমার কাছে আমার যে অপরাধ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেই পাপের ভরা মাথায় করিয়া আমি চলিলাম।

উপসংহার।

কত সুখে জীবন প্রভাত হইয়াছিল। সেই এক দিন, আর এই এক দিন!

আকবরের জীবনী বলিতে গিয়া নিজের কথাই বলিয়াছি। এখনও নিজের কথায় উপসংহার করিতেছি।—আমি সেই অমরেশ্বর।

নির্ব্বাত নিশ্চল সমুদ্র দেখিয়া,—সেই প্রশান্ত, মধুরনীলিম, অনুচ্চ-তরঙ্গমালা-মণ্ডিত, মোহন জলরাশি দেখিয়া লোকে মনে করিতেও পারে না—যে সমুদ্র কোটি কোটি হাঙ্গর কুম্ভীর বক্ষে ধারণ করিতেছে;—একবারও মনে করিতে পারে না—যে প্রচণ্ড সলিল-

শোষী দাবানল সেই সমুদ্রের মধ্যে থাকিয়া তাহার অন্তঃশোষণ করিতেছে;—কত অগ্ন্যুৎপাত, কত ঝড় ঝটিকা, কত খণ্ডপ্রলয় যে সাগর সহিয়াছে—তাহাও কেহ ভাবে না। তাহার সেই স্নিগ্ধ মধুর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া লোকে মনে করে,—সমুদ্র বিধাতার কি মধুর সৃষ্টি!

লোকে অনেক স্থলেই এইরূপ ভুল করে;—আমাকে দেখিয়াই বা না করিবে কেন? আমি এ জেলার প্রধান উকীল। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তমসা আমার গৃহদেবী। লোকে যাহা কিছু কামনা করে—কিছুরই অভাব নাই। সকলে মনে করে—আমি কত সুখী!

বড় দিনের ছুটি উপলক্ষে আমি বাটীতে বসিয়া পুরাতন কাগজ পত্র গুলি গুছাইতেছি। আমার দশমবর্ষীয়া কন্যা নলিনী সাহায্যকারিণী। নলিনী বড় বুদ্ধিমতী। এবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছে। তাহার জননীর ন্যায় নলিনীও আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে।

নলিনী পুরাতন বাক্স হইতে একখানি পুরাতন কাগজ বাহির করিয়া বলিল,—'বাবা, এ খানা কি দলিল গো? ইহাতে ত ইষ্টাম্প নাই?'

আমি দেখিলাম;—শরীর কাঁপিল; শিরায় শিরায় শোণিতস্রোত প্রবল বেগে বহিল;—পাদমূল হইতে মস্তক, মস্তক হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত শোণিতস্রোত বহিল। ক্ষণকালের জন্য শ্বাসরোধক্লেশ অনুভব করিলাম।

নলিনী বলিল,—'এ খানা কি দলিল বাবা, বল না।'

আমি। ওখানা উইল।

নলি। কার উইল বাবা,—কিসের উইল। ইহাতে যে তামার নাম—বাবা।

নলিনী দলিলখানি পড়িতে লাগিল। আমি বাধা দিলাম না;—

দিতে পারিলাম না। একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম;—প্রাণের ভিতর কিন্তু নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নি ঘোর তেজে জ্বলিয়া উঠিল। বাতায়নপথে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। নলিনী বলিল,—'এ সব বিষয় কি হইল বাবা,—এ সব কি আমাদের এখনও আছে?—কই কলিকাতায়ত আমাদের বাটী নাই।'

আমি সেই ভাবে বসিয়া কষ্টে উত্তর করিলাম,—'না।'

নলি। কি হইল বাবা?—চল্লিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ,—জিনিস পত্র—কলিকাতায় তিন খানা বাড়ী—কি করিলে বাবা?—এ সবই ত তোমাকে দিয়াছে।

নলিনী দলিল হইতে চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—'কথা কওনা কেন বাবা? বলনা—এ সব বিষয় কি হইল?'

আমি বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলাম,—'যাহাদের জন্য ঐ বিষয়গুলি আমার হাতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে দিয়াছি।'

নলি। তারা কে বাবা?—উইলে তাদের নাম নাই কেন, বাবা?—কোথায় তাদের বাড়ী?

আমি। দেবগ্রাম।

নলি। দেবগ্রাম কোথায় বাবা?

আমি। অনেক দূর;—যেখানে আমাদের তালুক, বাগান,—সেই দেশেই।

নলি। তারা তোমার কে বাবা?

আমার আর সহিল না। বুক ফাটিয়া গেল। নলিনীর নিকট ভাব গোপন জন্য চক্ষু [illegible] অলক্ষ্যে মুছিলাম। নলিনী কিন্তু সবই দেখিল;—বলিল,—'তুমি অমন করিতেছ কেন—বাবা;—কি হয়েছে?'

আমি। কিছু না।

নলি। তবে এদিকে মুখ ফিরাও না ; বল না, আক-বর কে ?

আমি। আকবর—দেবতা।

নলিনী আমার হাত ধরিয়া মুখ ফিরাই—'তুমি অমন কচ্চ কেন বাবা'—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গৃহের কবাট উন্মুক্ত হইল ;—বালিকা দ্বার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—'দেখ মা, বাবা কেমন কচ্চেন।'

নিমেষমধ্যে তমসা আমার পার্শ্বে ;—আমার হাত ধরিয়া কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন ; চখের জলে কথা মিশাইয়া বলিলেন,—'কি হয়েছে গো,—বল না—বল—কি হয়েছে ?'

আমার মত মানুষের যত দূর শক্তি সম্ভব,—সেই শক্তিতে আত্মসংযমের চেষ্টা করিলাম। কত দূর পারিলাম—জানি না। বলিলাম,—'দেখ, তমসা,—আমার এখন এমন সুন্দরবাড়ী ঘর হয়েছে ; টাকাকড়ি, জমিজমা হয়েছে ;—মান সম্ভ্রমও পেয়েছি ; তোমাকে পেয়েছি ; নলিনীকে পেয়েছি ; আমার বাবার হাতের বাগানগুলিও পেয়েছি ;—সমস্তই পাইলাম ;—কিন্তু মা কিছুই দেখিলেন না।